ব্রহ্মজ্ঞমায়ের কথা

প্রকাশক

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সেন

ব্রহ্মজ্ঞমায়ের কথা

প্রাপ্তিস্থান

নির্ব্বাণ মঠ ও শান্তি আশ্রম
বেলাবাগান, বৈদ্যনাথ
সাঁওতাল পরগণা

২০নং অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা—২৯

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন
শান্তি আশ্রম, বৈদ্যনাথ, দেওঘর
সাওতাল পরগণা।

তৃতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার :
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
দেব প্রিন্টিং প্রেস
২নং, মদন মোহন দত্ত লেন,
কলিকাতা—৬

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মাতাঠাকুরাণী।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যাঁহার কথিত উপদেশ ও তত্ত্বকথা প্রকাশিত হইল তিনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিতারা গ্রামে (থানা কচুয়া, পোঃ সাচার) ১২৮৬ সনের ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার শুক্ল একাদশী তিথিতে ৺অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকাদম্বিনী দেবী তাঁহার পিতৃদত্ত নাম। আটবৎসর চারি মাস বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনি বিধবা হন।

তিনি স্বভাবতঃ বিচারপ্রবণ ছিলেন এবং সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে রত থাকিতেন। শিশুকাল হইতেই চিন্তা করিতেন (১) মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, মরণের পর কি অবস্থা হয় এবং সে কোথা হইতে আসে এবং কোথাই বা যায়? পরে (২) সংসারে কিছুর মধ্যেই শান্তি নাই, শান্তি কোথায়? এই প্রকার চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। শেষ (৩) আমি কি? দেহ কি? মন কি? আত্মা কি?—ইত্যাদি তত্ত্ব অনুসন্ধানে রত থাকিতেন। এই তিন স্তরের চিন্তাই তাঁহার সাধন। গুরুর উপদেশ বা বই পুস্তকের সাহায্য

ব্যতীত, কেবল বিচার ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের দ্বারাই সমস্ত মায়া-জাল ছিন্ন করিয়া এবং মনের সকল সংশয় দূর করিয়া তিনি আত্মোপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় অধিকাংশ সময় তিনি দেওঘরেই অবস্থান করেন। শীত কালে কিছুদিন পুরীতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে দেশেও যান।

"ব্রহ্মজ্ঞ-ঠাকুরাণী", "দেবী-মা", "ঠাকুরাণী", "মা" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে তিনি পরিচিতা। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের সারগর্ভ উপদেশে অনেকের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু লোকের উপকারার্থ তাঁহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। ইহাতে কাহারও উপকার হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। "ব্রহ্মজ্ঞ-মা" সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন। তাঁহার কথিত ভাষার বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই; সুতরাং এ গ্রন্থে ভাষার পারিপাট্য নাই। আশা করি সুধী পাঠক ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন—ইতি।

বিনীত

কলিকাতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন।

সূচিপত্র

২৩শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৫৮
শুক্লা একাদশী
ইং ৭ই মার্চ্চ ১৯৫২।

ওঁ

মা

(১)

ব্রহ্মই সত্য ; আর সবই মিথ্যা। মিথ্যা বিষয়ে সুখ পাওয়ার জন্য মানুষের এত আগ্রহ, এত চেষ্টা, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানাই প্রকৃত সুখ ও শান্তি। তবুও আত্মতত্ত্ব জানিতে কেহই চায় না ; কারণ মানুষের মন বাসনায় মুগ্ধ।

(২)

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষ যে মরিতেছে তাহা দেখিয়াও অন্য মানুষের হুস্ হয় না।

(৩)

এই জগৎটা জলের নীচের গাছের মত। জলের নীচের গাছের ছায়া যেমন মিথ্যা, এই জগৎটাও তেমন মিথ্যা। এই জগৎ যে মিথ্যা—ইহা বুঝার নামই সাধনা।

(৪)

বৈরাগ্যই আত্মজ্ঞান লাভের মূল উপায়। বৈরাগ্য না থাকিলে সত্য অনুভূতি হয় না।

(৫)

ঠিক ঠিক জ্ঞান বিচার চাই। ঠিক বুঝ হইলে ছাড়িবার ধরিবার কিছুই থাকে না। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নাই। প্রকৃত শান্তি পাইতে হইলে জ্ঞান চাই।

(৬)

জ্ঞানে এক, প্রেমে দুই, কামে বহু। 'অহম্' ভাবে এক জ্ঞান থাকে; প্রেমে ভক্ত, ভগবান্ দুই, আর কামে—আমার দেহ, আমার স্বজন, আমার গৃহ ইত্যাদি বহু।

(৭)

ধর্ম্ম বলিতে আমি বুঝি—ভবসাগর হইতে পার হওয়ার চেষ্টা। ভুলে এই জগতে আসা হইয়াছে—ভুল ভাঙ্গিয়া মূলে যাওয়াই ধর্ম্ম।

(৮)

জলে যেমন বুদ্বুদের পর বুদ্বদ উঠে, মনেও তেমনি কল্পনার পর কল্পনা উঠিয়া মনকে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে লইয়া যায়। বিষয়-লিপ্সা দূর হইলে মন ক্রমশঃ স্থির হয়। মন স্থির হইলেই স্ব-ভাবে যাওয়া যায়।

(৯)

মানুষ বলে—ধর্ম্ম করি কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মের নামে কি করে তাহা তলাইয়া দেখে না। কি করিতেছে, ধর্ম্ম হইতেছে

কি না. তাহা বুঝিতে চায় না এবং বুঝিতেও পারে না। সারা জীবন কতগুলি বিধি নিষেধের নিয়ম পালন করিয়া যায়, কিন্তু আত্মোন্নতি কতটুকু হইল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে না। বিচার না থাকায় তাহা করিতে পারে না। মনে বিবেক বিচার না আসিলে বৈরাগ্য হয় না এবং বৈরাগ্য না হইলে ধর্ম্ম হয় না।

(১০)

চাই শুধু প্রাণের টান; যত যোগ বল, নিয়ম বল, কেবল ঐ টানটুকু লাভের জন্য; ঐ প্রাণের টান না হইলে সবই বৃথা।

(১১)

জগৎ যে কাল্পনিক—ইহা ধারণা করা চাই। বাসনা ত্যাগ না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে ঐ ধারণা জন্মিতে পারে না।

(১২)

মৃত্যুভয় কেন? মৃত্যুতে যে লোকের ভয় হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার দ্বারা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুবার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার যাতনা ভোগ হইয়াছে। সেই সংস্কার হৃদয়ে সুপ্তভাবে আছে বলিয়াই মৃত্যুর কথায় ভয় উপস্থিত হয়।

(১৩)

সমাধির সমান সুখ নাই, মৃত্যুর তুল্য দুঃখ নাই। সমাধির সুখ যেমন বলা যায় না, মৃত্যু-যাতনাও সেইরূপ বলা যায় না।

(১৪)

বেশী নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে; একে মোহ-নিদ্রা, তার উপর আবার ঘুম! মানুষ এমন সুন্দর নিস্তব্ধ রাত্রি কেবল ঘুমাইয়া কাটায়। রাত্রি বেলাই আত্মচিন্তা করিবার ঠিক সময়।

(১৫)

কাম উপভোগ বিষের লাড়ু খাওয়ার তুল্য; কাম উপ-ভোগই জগতে সব চেয়ে বড় পাপ। ইহাতে আত্মা যত আবৃত থাকে আর কিছুতেই সেইরূপ হয় না। এই লিপ্সা যত ত্যাগ হইবে আত্মার আবরণ ততই দূর হইবে।

(১৬)

মানুষ মনে করে—তাহারা বেশ বুঝে, সকল বিষয় জানে। কিন্তু ঠিক ঠিক বুঝে কই? তাহাদের সূক্ষ্ম বিচার শক্তি নাই। ঠিক বিচারে মনের বন্ধন তখন তখন কাটিয়া যায়!

(১৭)

মানুষ কামকে স্থূল ভাবে খারাপ মনে করে; কিন্তু সেটা উপর উপর খারাপ মনে করা। সূক্ষ্মভাবে উহাতে রস অনুভব হয়। যতদিন উহাতে রস পাইবে, ততদিন উহা দমন হইবে না। উহাতে যে প্রকৃতই রস নাই—ইহা বুঝাই ঠিক বুঝ্।

(১৮)

কোনও বিষয়ে রস আছে এই বোধ থাকিলে তাহা ছাড়া যায় না। সাপের মত, বিষের মত বিষয়-রস ভয়ঙ্কর ও বিরস বোধ হইলে, তাহা ত্যাগ করিতে কষ্ট হয় না। ঠিক বিচার দ্বারা যদি বুঝিতে পারা যায় যে বিষয়-রস মানুষকে সুখ দিতে পারে না বরং প্রকৃত সুখশান্তি ঢাকিয়া রাখে, তবেই বিষয়-রস বিষবৎ বোধ হইবে—এবং সহজে ছাড়া যাইবে।

(১৯)

আশাই মানুষকে স্থির হইতে দেয় না। আশা কেবল সুখ দিবে বলিয়া লোভ দেখায় কিন্তু সুখ দিতে পারে না। আশা না ছাড়িলে সুখ পাওয়া যায় না। আশা ত্যাগেই শান্তি। আশা যতই ছাড়া যায় মন ততই বন্ধনমুক্ত হয়।

(২০)

লোকের কি ভুল ! ভাল করিবার সময় আমি, মন্দ করিবার সময় তুমি। পাপ করিবার বেলায় ভগবান্ করাইয়াছেন —আর সৎ কাজ করিলে বলে 'আমি করিয়াছি'। হয় বল ঈশ্বরই সকল করাইতেছেন, না হয় বল সকলই স্বকর্ম্মফল।

(২১)

সত্যভাবের অল্পও ভাল। সত্যভাবে কোনও কপটতা নাই। অনেকে বলে, 'ধর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অমুকের জন্য পারিলাম না'। সত্যের প্রতি পিপাসা থাকিলে এরূপ কপটতা থাকে না। খাঁটি পিপাসা জন্মিলে সত্য পথে চলিতে কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। আসল কথা—ভিতরে সত্যভাবই নাই—তাহা না হইলে অন্যের কথায় কি কেহ কখনও বিষ খাইতে পারে ?

(২২)

মানুষের ছোট বেলায় খেলার পুতুল কিনিতে কত আগ্রহ থাকে! কিন্তু বড় হইলে আর পুতুল কিনিতে মন যায় না। সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু ফুটিলে সংসারের বিষয় পুতুলের মত মনে হয়। তাহাতে মন শান্তি পায় না। সংসারটা একটা রঙ্গতামাসার স্থান—কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সুখ নাই।

(২৩)

যতদূর ছাড়া যায়, ততদূরই পাওয়া যায়। সব ছাড়িলে 'সব' পাওয়া যায়।

(২৪)

'জীব আসে শূন্য যায় শূন্য, সঙ্গে নেয় কেবল পাপ পুণ্য' ; মরিবার সময় মানুষ স্থূল জিনিষ কিছুই সঙ্গে লইয়া যায় না। যার যেরূপ মনের ভাব, তাহাই সঙ্গে যায়। মনে কেবল বিষয় বাসনার সংস্কার থাকে।

(২৫)

কর্ত্তব্যবোধে মানুষ কি পশুর মত হীন কাজ করে! আসলে যে বিষয়ে মনের টান আছে তাহাই করিয়া যায় এবং তাহাতেই কর্ত্তব্যের ভাণ করে। আসক্তি আছে বলিয়াই কর্ত্তব্যের ছলনা—আসক্তির জন্যই কর্ত্তব্য জ্ঞান।

(২৬)

ইচ্ছাই সকলের মূল ; ধর্ম্মই বল আর অধর্ম্মই বল সকলের মূলেই ইচ্ছা। সত্য জানিতে চাও তাহাও ইচ্ছা, অসত্য লইয়া আছ তাহাও ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।

(২৭)

ইচ্ছা থাকিলে জীব শিব হইতে পারে। সত্য লাভের ঠিক ঠিক ইচ্ছা হইলে কোনও দুঃখ কষ্টের জন্য ভয় হয় না—আর কোনও ঠেকাও থাকে না।

(২৮)

মৃত্যুচিন্তাদ্বারা সহজে মনে বৈরাগ্য জন্মে। সাধকের পক্ষে মৃত্যু চিন্তা উন্নতির উপায়।

(২৯)

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কুল, মান ইত্যাদি অষ্টপাশ ছাড়িতে হইবে। পাগলেরও এসব নাই। তাই বলিয়া কি পাগলও সাধু? এই অষ্টপাশ ছাড়া অর্থ ধর্ম্ম করিবার সময় অন্যে কি বলিল, সেদিকে লক্ষ্য না করা, কাহারও কথায় লজ্জা বোধ না করা, কাহাকেও ভয় না করা; কুল মান এসবে উদাসীন হওয়া।

(৩০)

সর্ব্বদা জগতের অনিত্যতা বিচার করিবে। তবেই সব মায়া মোহ কাটিয়া যাইবে। এই জগত অনিত্য বোধ হইলে তাহাতে রস বোধ থাকিবে না। তখনই মন তাহা হইতে সরিয়া পড়িবে।

(৩১)

মানুষ এত চঞ্চল—বিষয় বাসনায় এত অস্থির যে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টি করিতে পারে না। পরে কি হইবে জানেনা, কেবল উপস্থিত বিষয় নিয়া আছে। স্থিরচিত্তে ভাবিতে পারিলে কিছু বুঝিতে পারিত; কিন্তু তাদের সে সময় কই? মানুষ মনকে বিষয় বাসনাদ্বারা এত চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থিরচিত্তে ভাবিতে পারে না।

(৩২)

কি অবুঝ রাজ্য! এ সংসার কেবল অজ্ঞানের খেলা। এই অজ্ঞানতায় মানুষ পশুর দল। যেমন পশুর মধ্যে ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি ভেদ আছে সেইরূপ মানুষের মধ্যেও সাজ-সজ্জার পার্থক্য। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যেই পশুভাব।

(৩৩)

জগতের অনিত্যতা ঠিক ঠিক বুঝাই জ্ঞান। বুদ্ধের এই জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়াই রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু এই জ্ঞানের অভাবেই ন্যাংটা তাহার নেংটি ছাড়িতে পারে না।

(৩৪)

ঠিক ঠিক ধনের মালিক হইয়াও ভুলেই তাহা হারাইয়া আছ। আত্মজ্ঞানের অভাবে তোমাদের সব জিনিষই পরের হাতে। কোন্ ভরসায় তোমরা দিন কাটাইতেছ? হাতের মাল হাতে না পাইয়া সুখ পাও কিরূপে?

(৩৫)

তোমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় 'আমি আছি', প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমাদের দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে—এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও 'আমি আছি'—এই স্থির ভাবটুকু থাকে। 'আমি নাই'—এই ভাব আসে না। এই যে 'আমি আছি' জ্ঞানটুকু তাহাই সত্য 'অহমস্মি' এর প্রতিবিম্ব।

(৩৬)

ছেলেরা যখন ঘুরণপাক খেলে তখন বাড়ী, ঘর, দুয়ার সবই ঘুরিতেছে দেখে। তোমাদের মন ও বিষয় কামনায় চঞ্চল বলিয়া স্থির হইয়া সত্য বস্তু দেখিতে পারিতেছ না। স্থির হও, স্থির হইলে সত্য দেখিতে পারিবে।

(৩৭)

ত্যাগেই শান্তি; কেহ কেহ বলে অন্তরে ত্যাগ,—বাহিরে ত্যাগ না হইলেও চলে—এসকল কপটতা; অন্তরে ত্যাগ

হইলে বাহিরে ত্যাগ না হইবে কেন ? অন্তরে বাহিরে যাহাদের ত্যাগ হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগই ঠিক।

(৩৮)

কুণ্ডলিনী শক্তি কি ? সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে কুণ্ডলিনী শক্তি আর কিছু নহে—আত্মাকে পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাকে প্রবল করার নামই কুণ্ডলিনীর জাগরণ। এই ইচ্ছা তীব্র হইলে আপনা আপনিই শ্বাসের ও নাড়ীর ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়।

(৩৯)

বিশ্বাসেই সকল হয়। সরল বিশ্বাস চাই। আত্মতত্ত্বে যদি বিশ্বাস হয় তবে সহজেই তাহার জন্য চেষ্টা হয়। কিন্তু সে বিশ্বাস কই ? জ্বর হইলে ডাক্তার কুপথ্য করিতে নিষেধ করিলে রোগী তাহা খায় না ; সামান্য দেহের জন্য এত আগ্রহ, তাহার মঙ্গলের জন্য এত বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেরূপ 'আত্মা আছে' বলিয়া বিশ্বাস হইলে তাহার জন্য চেষ্টা না করিয়া পারিত কি ? মানুষের অস্থায়ী বিষয়ে বিশ্বাস হয় কিন্তু নিত্য বস্তু আত্মার প্রতি বিশ্বাস হয় না।

(৪০)

ভুলই যত দুঃখের কারণ ; দুঃখ হইলে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলে দুঃখ থাকে না। কিন্তু তাহা বুঝিবার অক্ষমতাই দুঃখের কারণ। এজন্য যত ভুল, তত দুঃখ।

(৪১)

যত রাখিবে গুপ্ত, তত হইবে শক্ত। আত্মতত্ত্ব যত গোপন রাখা যায় ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রকাশে তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায়।

(৪২)

অনেকে বলে—সংসার ছাড়িতে পারিনা। সংসারটা কি? সংসার বলিয়া কিছু নাই; সংসার মনের ভ্রম মাত্র নিজ বাসনায় গড়া। বাসনা না থাকিলে কোনও সংসার থাকে না।

(৪৩)

মাকড়সা জাল পাতিয়া তাহাতেই বদ্ধ হয় এবং কষ্ট পায় মানুষও আপন কামনা বাসনার সংসার তৈয়ারী করিয়া তাহাতেই বদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করে।

(৪৪)

ভোগদ্বারা কখনও ভোগের ইচ্ছা নিবারণ হয় না। পায়ে কাদা লাগিলে আরও কাদা মাখিলে তাহা পরিষ্কার হয় কি?

(৪৫)

ছাড়ন ধরণ কি? জ্ঞান হইলে বুঝিবে কিছু ছাড়িবার বা ধরিবার নাই; যাহা আছে আছেই। একমাত্র 'বিরাট আমি'ই বর্ত্তমান।

(৪৬)

ভিতরে বিবেক বৈরাগ্য না থাকিলে কোনও পুঁথি-পুস্তকে কিছু করিতে পারে না; যাহাদের ভিতরে জ্ঞানের পিপাসা আছে তাহারাই পুঁথি-পুস্তক দ্বারা লাভবান হইতে পারে।

(৪৭)

অনেকেরই অবস্থা দীন হীন কাঙ্গালের মত। যৎসামান্য যাহা কিছু পায় তাহা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এই সংসারের শত রকমের দুঃখের মধ্যে সামান্য ভোগ সুখেই সন্তুষ্ট থাকে। অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া সামান্যতেই সন্তুষ্ট। কি মোহ!

(৪৮)

একটা ইচ্ছা প্রবল হইলেই অন্য ইচ্ছা ত্যাগ হয়। একদিকে দৃষ্টি রাখিলে অন্য দিক দেখা যায় না। বিবেক বিচারের সাহায্যে এক আত্মাই সত্য—ইহা বুঝিতে পারিলে এবং আত্মাকে পাইবার প্রবল ইচ্ছা হইলে অন্য ইচ্ছা দমন হইয়া যায়।

(৪৯)

লোকে বলে ইহার প্রয়োজন, উহার প্রয়োজন; আমি একমাত্র মুক্তিলাভের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য প্রয়োজন দেখিনা। অন্য প্রয়োজন কেবল কথার কথা, আত্মলাভের প্রয়োজনই সত্য কথা।

(৫০)

পায়ের নীচে মাটী না থাকিলে মানুষ চলিতে পারে না। কিন্তু তবুও যেমন সেই মাটীর প্রতি আসক্তি থাকে না, তেমন জীবন ধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলেও তাহার প্রতি আসক্তি থাকা উচিত নয়।

(৫১)

এই যে নানা সাধুর নানা কথা তাহার কারণ, যে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছে সে ততদূর মাত্র বলিতে পারে—তাহার নিকট ততদূরই সত্য। মোটের উপর চরম সত্য দ্বৈতও, নয় অদ্বৈতও নয়—তাহা দ্বৈতাদ্বৈত বর্জ্জিত।

(৫২)

স্বপ্নের মত জাগরণও যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ স্বপ্নের অবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় পরে জাগিয়া উঠিলে আবার তাহাই মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ জাগরণ অবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, মন স্থির হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে এ সকলকেই মিথ্যা অনুভূত হয়।

(৫৩)

বাহিরের ত্যাগ ত্যাগ নহে। আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ।

(৫৪)

অনেকে মনে করেন সাধুপুরুষেরা যখন সর্ব্বত্যাগী তখন তাঁহাদের খাওয়া পরার প্রয়োজন কি? ইহা ভুল! সাধু হইলেই যে তাঁহার দেহধর্ম্ম ক্ষয়বৃদ্ধি থাকিবে না এমন নহে। অবশ্য এই ক্ষয়বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের কোন সংশ্রব এবং আসক্তিও নাই কিন্তু যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন দেহধর্ম্ম, আহার বিহার থাকিবেই।

(৫৫)

"হরির নামে ভক্ত, কড়ির নামে শক্ত"। অনেকে খুব ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে চায় কিন্তু ত্যাগের কথা বলিলে তাহাদের মুস্কিল উপস্থিত হয়।

(৫৬)

দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের সোপান মাত্র। অদ্বৈতবাদ বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তি দ্বৈতবাদ দ্বারাই অদ্বৈতজ্ঞানে পৌঁছিতে পারে।

(৫৭)

অনেকে বলে স্বদেশের কাজ করা দরকার। ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আত্মচিন্তা হইতে আর বড় স্বদেশের কাজ নাই। আত্মাই প্রকৃত স্ব-দেশ।

(৫৮)

মস্তিষ্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচার করিবে এবং হৃদয় দ্বারা তাহা অনুভব করিবে। হৃদয়ই অনুভবের স্থান। শুদ্ধ মনে তত্ত্বভাব স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। হৃদয়ের-আবেগই উপায়। তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধি চাই।

(৫৯)

সত্যের পিপাসা বাড়ানোর উপায় সৎকথা, সৎকর্ম্ম, সৎচিন্তা ও সৎসঙ্গ।

(৬০)

ক্ষুদ্রমন একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই ভাঙ্গিয়া প্রশস্ত হয়। হিংসা, নিন্দা, যশ, মান, কামক্রোধের বশীভূত হইলেই মন ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জানিবে ত্যাগের বলই বড় বল। বাড়ীঘর ত্যাগ করার নাম ত্যাগ নহে। হিংসা, নিন্দা, যশ. মান ও কামনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ।

(৬১)

মানুষ অভ্যাসেই বদ্ধ, অভ্যাসেই মুক্ত। মুখে অদ্বৈত কথা বলিলেই অদ্বৈত অবস্থা লাভ হয় না। অদ্বৈত অবস্থা লাভ করিতে হইলে এ জগতে বাঁচিয়া থাকিয়াও মরিতে হয়— না মরিলে তাহা কিছু বোঝা যায় না।

(৬২)

জলে যদি তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠে তবে সেই জলে নিজ প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হয় না। জল যদি স্থির থাকে তবে সেই জলে প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। সেইরূপ মন যদি স্থির হয় সমস্ত মোহ ঘুচিয়া হৃদয়ের সকল সন্দেহের মূল ছিন্ন হয় ও আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। তখন আর কোন সন্দেহ সেই উপলব্ধ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারে না। এই মনরূপ সমুদ্রে বাসনারূপ বাতাসেই তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই বাসনারূপ বাতাস বারণ করিতে পারিলে মনরূপ সমুদ্র স্থির হয়।

(৬৩)

কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকে "সে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে জয় করিতে পারে সে নিশ্চয়ই অপরের মৃত্যু জয় করাইয়া দিতে পারে"। এই কথা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু কেবল যাহারই মৃত্যু জয় করিবার তীব্র আকাঙ্খা আছে শুধু তাহারই মৃত্যু জয় করাইয়া দিতে পারে—অপরের নহে।

—:*:—

পদ্য

(১)

আমি পরম জ্যোতি নিত্য শিব চিন্ময় ;
আমি অজর অমর নাহি মম কোন ভয়।
আমি অখণ্ড, অব্যয়, নির্ব্বিকল্প রূপ ;
নাহি মন, বুদ্ধি, দেহ আনন্দ মম স্বরূপ।
নাহি মম ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি অহঙ্কার ;
নাহি মম কোন ইচ্ছা আমি নির্ব্বিকার।
নাহি মম পিতা মাতা পুত্র পরিজন ;
নাহি কোন কর্ত্তব্য জনম মরণ।

———

(২)

সংসারের মহারণ্যে ভ্রম কার অন্বেষণে
কেউত তোমার আপন নয় ;
বদ্ধ হ'য়ে মায়া জালে আত্মতত্ত্ব আছ ভুলে
তুমি কে তার লও পরিচয়।
বাসনা তরঙ্গ সনে কর খেলা আপন জ্ঞানে
'আমি' কি তা ভাব না একবার ;
পূর্ব্বে তুমি ছিলে কোথা কেবা ছিল পিতামাতা
কেই বা তোমার বন্ধু পরিবার।
আশার স্বপন মাঝে সাজিয়ে নটের সাজে
হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান ;
এ আঁধার দুঃখ নীরে মত্ত হ'য়ে আছ প'ড়ে
না করিলে আপন সন্ধান।

———

(৩)

কে তুমি সংসার বনে কর বিচরণ ;
কে তোমার পিতামাতা কোথা নিকেতন ?
যশ, মান, ধন তরে সদাই চঞ্চল ;
জীবন তোমার হয় পদ্মপত্রে জল।
এখনই মরণ হবে যাবে সব ছেড়ে ;
পূর্ব্বে তুমি ছিলে কোথা দেখ মনে ক'রে।
পেয়েছ আদর কত জননী পোষণ ;
হেন স্নেহময়ী ছেড়ে শ্মশানে শয়ন।
কালগ্রাসে নিপতিত হইবে যখন ;
কোথা রবে প্রেয়সীর মধু আলাপন।
কাম ক্রোধ মোহ বশে হয়েছ অজ্ঞান ;
আশার তিমির মাঝে রয়েছ শয়ান।
আশার কুহকে পড়ে ভুলেছ আপনা ;
সহিতেছ শোক, তাপ, জঠর যাতনা।
ধন, মান, যৌবন, দেহ অহঙ্কার ;
কালের করাল গ্রাসে হবে ছারখার।

প্রাণ সম প্রিয় জন স্বপনের প্রায় ;
কোথা চলে যাবে, আর না দেখিবে হায় ।
ছিল তব পরিবার—কত শত বার ;
কোথা চ'লে গেছে তারা ভাব একবার ।
মোহ নিদ্রা বশে তুমি দেখিছ স্বপন ;
পিতামাতা, ভাই বন্ধু কেহ না আপন ।
যতদিন দেহ আছে অবনী ভিতরে ;
দেহ নাশে ভাই, বন্ধু ভুলিবে অচিরে ।
এ সংসার নাট্যশালে নটের খেলায় ;
সাজে কত শত্রু মিত্র কোথা চ'লে যায় ।
সত্যপথে চল সবে নিজ নিকেতনে ;
কেন বৃথা ভ্রমিতেছ অবিদ্যা কাননে ?
জ্ঞানেতে নিবাও তুমি বাসনা অনল ;
জ্ঞান, বৈরাগ্য হোক সঙ্গের সম্বল ।
মায়া-আবরণ এবে ঠেলে দূরে,
জ্বাল জ্ঞান-দীপ হৃদি আলো করে ।
সরাও সরাও তুমি ভবের জঞ্জাল ;
চির শান্তি ধামে তবে রবে চিরকাল ।

———

(৪)

নিত্য রসে নিত্য স্থানে   ব'সে থাক আপন ধ্যানে ;
আপন মনে আপন গান গাও,
সে আনন্দ স্বরূপেতে   ডুবে থাক আপনাতে ;
আপন রঙ্গ আপনি এবে চাও।
আপনাকে আপনি খোঁজ,   আপনাতে আপনি মজ
আপন পায়ে আপনি দাঁড়াও।
তুমি বিনে কেউ নাই আর,   ধাঁধা বাজি এ সংসার
তোমার তরঙ্গ সনে তুমিই খেলাও ;
সে তরঙ্গ ক'রে বারণ,   আপনাকে কর বরণ
আপন পানে আপনি ফিরে চাও ;
প্রকৃতি কুহক জালে   বদ্ধ হ'য়ে আছ ভুলে
তোমার তুমি চিনে এবার লও।
নির্ব্বিকল্প রূপ তোমার,   তুমি আত্মা নির্ব্বিকার
এবার তুমিই তোমার হও।

---

(৫)

যশ মান ধন তরে অবিদ্যা আঁধারে পড়ে
হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নাহি তাহে মিটে সাধ ঘুচে না কভু বিষাদ
নাহি হয় আশা-অবসান ॥
বিষম মায়ার জালে বদ্ধ হ'য়ে আছ ভুলে
তুমি কে তা করনা সন্ধান।
কোথা হ'তে এ'লে ভবে কোথাই বা চ'লে যাবে
দেহ যবে হবে অবসান ॥
কত শত বার জনম তোমার
হ'য়েছিল এ সংসারে
পিতামাতা ভ্রাতা বন্ধু পরিবার
কেবা কোথা আছে প'ড়ে ?
দাসত্ব শৃঙ্খল পায়ে ঠেকেছ কর্ত্তব্য দায়ে

কি কর্ত্তব্য জগতে তোমার ;
কাহার সুখের তরে সদা প্রাণ কেঁদে ফেরে
কে করিবে ভবসিন্ধু পার ?
পড়িয়া সংসার মাঝে সাজিছ নটের সাজে
কেহ নয় তোমার আপন ;
ধন উপার্জ্জন ক'রে পোষ যারে মহাদরে
মুখে তারা দিবে হুতাশন।
পরিজন মায়াপাশে যেই জন বাঁধা আছে
জ্ঞান সূর্য্য হয় না প্রকাশ
কাম ক্রোধ আদি যত হিংসা দ্বেষ বশীভূত
গলে বাঁধা সদা কাল-পাশ ॥

———

(৬)

আশার কুহকে তব সংসার ভ্রমণ ;
কে তুমি কোথায় ছিলে করহ স্মরণ।
ভুলি নিজ নিকেতন অবিদ্যা তিমিরে ;
ধন, জন, যৌবন ক্ষণেকের তরে।
দেখিছ সবার গতি শ্মশানে শয়ন ;
তবু এই ভ্রান্ত জীব না হও চেতন।
কাম, ক্রোধ লোভ বশে সতত চঞ্চল ;
অমৃত ফেলিয়া ভোগ করিছ গরল।

---

(৭)

কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হ'য়ে লভেছ জনম ;
কে তুমি কোথায় ছিলে কোথায় গমন।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সুন্দর যৌবন ;
যশ, মান, ধন তব আশার স্বপন।
এখনই মরণ হবে জানিও নিশ্চয় ;
দারা, সূত পরিবার তব পথের পরিচয়।
হারায়ে তত্ত্বজ্ঞান ভুলেছ আপনা ;
ভুগিতেছ সুখদুঃখ জঠরযাতনা।

---

(৮)

ছাড় হে অজ্ঞান জীব ধন, জন, আশ ;
জ্ঞানের আলোক জ্বালি করহ প্রকাশ।
অজ্ঞান তিমির হ'তে উঠহে সত্বর ;
পরম আনন্দ ধাম নাহি আত্ম পর।
দূর করে ফেল সব ঘৃণা লজ্জা ভয় ;
অজ্ঞান দেখিয়ে তোমায় হাসিবে নিশ্চয়।
কাম, ক্রোধ, লোভ বশে আছে যেই জন ;
কভু নাহি হয় তার বন্ধন মোচন।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, যায়া সূত পরিজন ;
বিবেক অসিতে ছেদ মায়ার বন্ধন।
ছাড় দেহ অভিমান, ভাঙ্গ অহঙ্কার ;
শান্তির পথে চল সরাও অন্ধকার।

কেহবা করিবে আদর ঘৃণিবে দুর্ব্বল ;
চেয়োনা কাহার দিকে থাকিও অটল।
নাহি তথা সুখ দুঃখ, নাহি কোলাহল ;
নীরব নিস্তব্ধ সদা আনন্দ কেবল।
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি জনম মরণ,
নাহি পাপ, পুন্য ত্রিতাপ বন্ধন।
নাহি লিঙ্গালিঙ্গ নাহি ভেদ জ্ঞান ;
একমাত্র পরমাত্মা আছে বিদ্যমান।

চিঠি।

১ নং

রাঁচি

৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৫

কিছু চাওয়াই দুঃখের কারণ। কিছু না চাওয়াই শান্তি। যেখানে কিছু না চাহিয়া ভালবাসা যায় সেখানে কোন দুঃখ থাকিতে পারেনা। যাকে যতদূর আপন জ্ঞান করা যায় তাহা দ্বারাই তত দুঃখ পাইয়া থাকে। কিছু না চাহিয়া আপন জ্ঞান করিলে সেখানে কোনও দুঃখই থাকিতে পারে না। যাহার সঙ্গে যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহার দ্বারাই মানুষ তত তীব্র দুঃখ পায়। দুঃখের কারণ সুখ চাওয়া, তাই ত্যাগই শান্তি।

যে কাম, কাঞ্চন ভোগ, অবিবেকীর পক্ষে অমৃতময় মনে হয়, সেই কাঞ্চনই বিবেকী লোকের নিকট কাকবিষ্ঠা বৎ বোধ হয়। এক বস্তুই অবস্থানুসারে বিষ ও অমৃত হয়।

আমি তোমাকে যাহা লিখিতেছি—ইহা আমার ভুল মায়া। তুমিই বা কে? আমিই বা কে? যেই আমি, সেই তুমি। যেই তুমি, সেই আমি। বহুরূপ ধারণ—আত্ম স্বরূপ ভুলার কারণ আমা হইতে সৃষ্টি আমাতেই লয়।

সৃষ্টির কারণ কর্ত্তা কেবা বল হয়।
কেন হয় সৃষ্টি, স্থিতি কেন হয় লয় ?
মরণ কাহার হয় ? কাহার জনম ?
রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি ভোগে কি কারণ ?
কে আবার করে কর্ম্ম ? কেবা পায় সুখ ?
কে আবার হয় তৃপ্ত ? কেবা পায় দুঃখ ?
কে আবার আশার স্রোতে ভ্রমিছে নিয়ত ?
জীব নামে কে আবার হয় অভিহিত ?
মন, বুদ্ধি অহঙ্কার বল কেবা হয় ?
তুমি কে ? তা মোরে দেও পরিচয়।

ইতি—

---

২ নং

দুর্ব্বলতাই সব দুঃখের কারণ ; এই দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভে অগ্রসর হও। মানুষ নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিতে ভাবিতে দুর্ব্বলই হইয়া যায়। তুমি তোমার স্বাধীনতার স্বরূপ ভুলিয়া দুর্ব্বলতার অধীন হইয়াছ। তুমি মনে করিতে পার তোমার মধ্যে সেই স্বাধীন শক্তি নাই। বাস্তবিক তোমার মধ্যে সেই শক্তি আছে ; তুমি স্বাধীন, তোমাকে কে দুর্ব্বল করিতে পারে ? তুমি নিজেই ভীরুতা, দুর্ব্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া আছ।

বই, পুস্তক, শাস্ত্র ইত্যাদি অথবা কাহারও কথায় স্বাধীনতার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায় না, ইহা নিজের ভিতরের জিনিষ। নিজের চিন্তা দ্বারাই বাহির করিতে হয়। বাহিরের কিছুর মধ্যেই ইহা পাওয়া যায় না। মানুষের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি কর্ম্মানুযায়ী হইয়া থাকে। কর্ম্মানুসারেই জ্ঞান, বুদ্ধি বিকাশের তারতম্য হয় ; সীমাবদ্ধ কর্ম্মে সীমাবদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হয়। মানুষ সীমাবদ্ধ নিজেই হয় ! অসীমও মানুষ নিজেই হইতে পারে। উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিও না। উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতা নয়। একমাত্র সবলতাই স্বাধীন শক্তি বিকাশের উপায়। মানুষ নিজেকে নিজে ভুলিয়া আছে

বলিয়াই দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। বহির্দ্দৃষ্টি ছাড়িয়া নিজের দিকে তাকাইলেই সব দুর্ব্বলতা দূর হইয়া স্বাধীনতার বিকাশ হয়।

জন্মমরণের কর্ম্মই কারণ। কর্ম্মদ্বারাই মানুষ বদ্ধ হয়। আর কর্ম্ম ত্যাগ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। আশাই মানুষকে বদ্ধ করে;. আশা নিরাশার পরপারেই মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি।

ইতি—

৩ নং

মানুষ স্থির হইতে পারে না বলিয়া কিছুই ভাবিতে পারে না। এমনকি ধারণাও করিতে পারে না। যদি স্থির মনে ভাবিতে পারে, তবে সব বিষয় বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারে। মানুষের অস্থির হওয়ার কারণ—কতকগুলি বাসনার তরঙ্গ ; তাই ত্যাগই স্থিরত্বের উপায়। মানুষ যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থার অতিরিক্ত কিছুই ধারণা করিবার শক্তি তাহার নাই। কাজেই সে অবস্থাকেই সত্য বলিয়া বোধ করিতেছে। বালক বালকের অবস্থাকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছে। যুবক যুবকের অবস্থাকে, বৃদ্ধ বৃদ্ধত্বকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু এই তিন অবস্থার এক অবস্থাও সত্য নয় ; কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার অতীত যে একটী অবস্থা আছে, সেই অবস্থা সম্যকরূপে জানিতে পারিলে জন্ম ও মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। অবশ্য সেই অবস্থা লাভ করিতে মানুষের মাঝে মাঝে পিপাসা হয়। কিন্তু মানুষ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় বদ্ধ থাকিয়া তাহার অতীত অবস্থা জানিতে চায় বলিয়াই মানুষ তাহার ঈপ্সিত অবস্থা লাভ করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহাকে পশ্চাতের বস্তু দেখিতে হইলে যেমন সম্মুখের দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হয়, সেইরূপ মন এক দিক হইতে না উঠিলে অপর দিক ধারণা করিতে পারে না। মানুষের অবস্থা অনুসারে বুদ্ধি, ও অবস্থা অনুসারে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানুষ যখন স্বপ্নে থাকে, তখন কি সে স্বপ্নকে মিথ্যা মনে করে? কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে স্বপ্ন মিথ্যা হইয় যায়। জাগ্রত অবস্থায় জাগ্রতকেই সত্য বলিয়াই মনে হয়। আর স্বপ্ন অবস্থায় স্বপ্নকেই সত্য বলিয়া বোধ করে। এখন স্বপ্ন অবস্থাই সত্য, না জাগ্রত অবস্থাই সত্য? মানুষ যখন যে অবস্থায় থাকে; তখন সে সেই অবস্থাকেই সত্য মনে করে। আবার অবস্থার অতীত হইয়া গেলে সেই অবস্থা মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। বিচার, তর্ক, যুক্তি, অবস্থা অনুসারে হইয়া থাকে। এক বিচার মানুষকে মুক্ত করে, এক বিচার মানুষকে বদ্ধ করে। সংযত মনের বিচার মানুষকে মুক্ত করে, আর অসংযত মনের বিচারই মানুষকে বদ্ধ করে।

মানুষ যদি ভাবিতে পারে, আমি কি? দেহ কি? মন কি? তবেই মানুষ যত সব মোহান্ধকারের অতীত হইয়া মূল কারণ জানিতে পারে। যেমন কূপের ভেক কূপে থাকিয়াই সমুদ্রের ধারণা করিতে চায়, তাই সমুদ্রের ধারণা করিতে না পারিয়া সমুদ্রের অস্তিত্বই স্বীকার করে না; সেইরূপ বদ্ধ মানব

নির্ব্বাণ মুক্তির ধারণা করিতে না পারিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিকে কল্পনা বলিয়া মনে করে। নিজেকে জানিতে হইলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে হইলে—শুধু তর্কের দ্বারা হয় না; একমাত্র মনকে স্থির করিতে পারিলেই এই অবস্থা লাভ করা যায়।

একব্যক্তি মদ্যপান করিয়া মাথার দ্বারা একটি রাস্তা ঠেলিয়া বলিয়াছিল, "এই রাস্তাটি বাঁকা, আমি ইহা সোজা করিতেছি"। আর এক মদ্যপায়ী চাষা ক্ষেতের উপর দিয়া সাঁত্রাইয়া বলিয়াছিল, "আমি একটি বড় নদী সাঁত্রাইয়া পার হইতেছি"। ইহার ফলে একজনের মাথা ব্যথা, আর একজনের গা ক্ষত বিক্ষত হইল। কিন্তু রাস্তাও বাঁকা ছিল না, ঐ ক্ষেতেও জল ছিল না। সেইরূপ মানুষও মোহের বশীভূত হইয়া মিথ্যা সংসারকে সত্য মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করে, মৃত্যু জয় করা অসম্ভব; তাহাদের এ ধারণা ভুল। মৃত্যু জয় করা সম্পূর্ণ সম্ভব। কাহারও ভিতর কোনও বিশেষ শক্তি জাগ্রত হয়, কাহারও ভিতর তাহা হয় না। তাহার কারণ, যে যে মাত্রায় যে শক্তির সাধনা করে, সেই মাত্রায়ই তাহার সেই শক্তি জাগ্রত হয়। পূর্ণ চেষ্টায় পূর্ণ শক্তি জাগ্রত হয়। পূর্ণ শক্তি জাগ্রত হইলেই মৃত্যু জয় হয়;—জন্ম মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। অনেকে মনে করে, আমার যখন এই শক্তি নাই, তখন অন্য কাহারও এই শক্তি

থাকিতে পারে না। কাক যেমন খাদ্য লুকাইবার সময় নিজে চক্ষু বুজিয়া মনে করে—আমি যখন দেখিতেছিনা—তখন অন্য কেহই আর দেখিতেছে না। সেইরূপ শক্তি হীন ব্যক্তিরাও সকলকেই শক্তি হীন বলিয়া মনে করে। নিজের অবস্থাদ্বারা অপরের অবস্থা বিচার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যে অবস্থা কল্পনার অতীত, সেই অবস্থাকে অনেকে কল্পনা বলিয়া মনে করে। কল্পনা জালে বদ্ধ থাকিয়া কল্পনাতীত অবস্থাকে কি করিয়া ধারণা করিবে?

মানুষ একবার ভাবিয়া দেখে না, কোথা হইতে আসিতেছে? কোথায়ই আবার যাইতেছে? কেই বা আসিতেছে—কেই বা যাইতেছে? মৃত্যুই বা কি? জন্মই বা কি? আশাই বা কি? নিরাশাই বা কি? আমি বা কি? আমার মোহই বা কি? দুর্ব্বলতাই বা কি? আর ভয়ই বা কি? আসিতেছে, যাইতেছে, দেখিতেছে, শুনিতেছে যে শক্তি, সে শক্তি কি? এই সবগুলির মূল কারণ জানিয়া মৃত্যু জয় করা সম্ভব কি অসম্ভব—সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত বলা যায়। তাহার পূর্ব্বে কিছু বলা পাগলের প্রলাপ মাত্র। আঁধার ঘরে কত কি সাপ, ব্যাঙ্ কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু আলো জ্বালিলে সব ধাঁধা ঘুচিয়া যায়। ইতি—

—————

৪ নং

রাঁচি

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩৫

মা ছেলেকে ভালবাসে, চায় ছেলের মঙ্গল। ছেলে যদি মূর্খও হয়, তবুও মার ভালবাসা এক ভাবেই থাকে। কিন্তু ছেলের মূর্খতার দরুণ মা অন্তরে কিছু দুঃখানুভব করে। ছেলের মূর্খতার জন্য ছেলে দুঃখ পাবে বলিয়াই মায়ের দুঃখ।

(১)

যখন আপন হ'তে দূরে সরে থাকি,
তখন ছেলেজ্ঞানে তোমাকে নিরখি।
আপন গভীর ভাবে যবে আমি ডুবি,
আপন হ'তে আপন তোমারে ভাবি।
'আমি' 'তুমি' ভেদ যবে নাহি থাকে আর;
মম সনে মিশে তুমি হও একাকার।

(২)

দিন যায় রাত্রি যায় কাল বয়ে যায়,
তুমি নর, তব হুস্ নাহি কভু হয়।
পুনঃ পুনঃ কত আর করিব বর্ণন,

ভাঙ্গিল না তব ঘোর নিশার স্বপন।
মোহ অন্ধকার বশে হ'য়ে অচেতন,
গেল বাল্যকাল তব, এসেছে যৌবন।
জরা মৃত্যু অকস্মাৎ করে আক্রমণ;
ভেবেছে কি ভালরূপ এই সব কখন ?
তাহা না হইলে কোন সুখে দিন কাটাইতেছ ?

(৩)

একবার দেখ দেখি মেলিয়া নয়ন,
জীবনের যৌবনের—স্থিতি কতক্ষণ ?
আপনি আপনে রয়েছ ভুলিয়ে
বিষয় বিলাসে রয়েছ মজিয়ে;
সুখ-সূর্য্য তব স্বপনের মত,
কালগ্রাসে পুনঃ হবে নিপতিত।
ভ্রান্তি মরীচিকা হবে যবে নাশ,
জন্ম মৃত্যু ভয় হবে তব দাস।

(৪)

এ হেন শুভ দিন কবে আসিবে
বিবেক বৈরাগ্য তোমাতে জাগিবে ?

(৫)

এ ঘোর আঁধারে সংসার তিমিরে
ডুবেছে তোমার মন,
মিটে না পিপাসা বাড়ে শুধু আশা
ভুলিয়ে আপনি আপন।

ইতি—

———

বার বার বল আর কত বার,
ঘুচিল না তব এ মোহ আঁধার।

এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে কোন এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার কুটীরও ছিল ক্ষুদ্র, কাজও ছিল ক্ষুদ্র। মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহার সবই ছিল ক্ষুদ্র। তাহার এ ক্ষুদ্র মন, বুদ্ধিদ্বারা ক্ষুদ্র কুটীরের বাহিরে যে আরও কত বিরাট স্থান, বিরাট কর্ম্ম আছে ও তাহার সঙ্কীর্ণ মনের বাহিরে যে কত বিরাট ভাব সমূহ আছে তাহা সে ধারণাই করিতে পারিত না। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বদ্ধ থাকাই সে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত।

গণ্ডীর ভিতরে থাকাই কর্ত্তব্য, না গণ্ডীর বাহিরে যাওয়াই কর্ত্তব্য—ইহা সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি একবারও ভাবিয়া দেখিত না। সর্ব্বদাই সঙ্কীর্ণ আঁধার কুটীরে বাস—তাহার ভাবিবার শক্তিই বা কোথায়? যদি আঁধার কুটীর হইতে বাহির হইতে পারিত, তবে না সেই বিরাট আকাশ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তাহাকে যদি অপর কেহ গণ্ডীর বাহিরে কি আছে একবার আসিয়া দেখিতে বলিত—তদুত্তরে সে বলিত, 'আমি ত এখন আমার কুটীরের নানা কাজে ব্যস্ত আছি। বাহিরে

গিয়া এই সব দেখিবার ও ভাবিবার আমার অবসর কোথায়? পাছে তাহার সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর কর্ত্তব্য নষ্ট হয় ভাবিয়া সে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত এবং গণ্ডীর বাহিরে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইত না।

না বুঝে আপন হিতাহিত,
বুঝাইলে বুঝে বিপরীত।

তাহার অবস্থা কেমন? যেমন চিত্রের পদ্মে ভ্রমর। তাই পিপাসাও মিটে না, তৃপ্তিও হয় না।

নাই যার ত্যাগবল নাই বৈরাগ্য সম্বল
সদা দাসত্ব শৃঙ্খল পায়;
কোথা পাবে শান্তি, কোথা পাবে তৃপ্তি,
দগ্ধচিত্ত অতৃপ্ত আশায়?
হেন ক্ষুদ্র প্রাণে বল কিবা প্রয়োজন,
এ বিশ্ব তরে নাহি কাঁদে যাহার মন?

যে মন একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর জন্য কাঁদে, সেই মন কেন বিশ্ব জগতের জন্য কাঁদে না? যে মন ক্ষুদ্র গণ্ডীকে আপনার মনে করে সে মন কেন এই বিশ্বকে আপনার মনে করে না? যে মায়া এই ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ আছে, সেই মায়া কেন সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে না? ভেদজ্ঞানই সর্ব্বদুঃখের কারণ। এই ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ থাকা কি মানুষের কর্ত্তব্য?

অজ্ঞান অন্ধকারে বসিয়া বিজ্ঞান পাঠ করিলে আত্মজ্ঞান ফুটে না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন তৃপ্তিও কেহ পায় না। এক আত্মজ্ঞানই মানুষের তৃপ্তি ও শান্তি। তুমি যে অবস্থায় আছ এবং যাহা করিতেছ তাহাতে শান্তি ও তৃপ্তি আছে কিনা একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি ত ডাক্তার। অপরের রোগের চিকিৎসা কর, তোমার জন্মমৃত্যু রোগের চিকিৎসা তুমি করিয়াছ কি? এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর অতৃপ্ত বাসনায় লিপ্ত থাকিয়া কি করিতেছ? যেমন অন্য সাপ সঙ্খিনী সাপের আকর্ষণে নিজে তাহার মুখে ক্রমশঃ প্রবেশ করে, তুমিও সেইরূপ মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিতেছ। কখন যে পূর্ণ মাত্রায় মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই—এই মুহূর্ত্তেও মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিতে পারে। এই বিষয়ে তোমার বিন্দুমাত্রও হুঁস নাই—ইহাতে বিস্মিত আছি। তুমি যে কি মহা ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ। কুতর্ক না করিয়া আপন সঙ্গে আপনি তর্ক করিয়া মীমাংসা কর। অন্যের সঙ্গে তর্ক করিয়া কেহ কখনও তাহার স্বরূপ লাভ করিতে—অসীম হইতে পারে না। নিজের ভোগ বাসনার সঙ্গে—যুদ্ধ করিয়া এই বাসনাকে পরাস্ত করিয়াই মানুষ তাহার স্বরূপলাভ করে—অসীম হইয়া যায়। তুমি ঘোর কুহকে পড়িয়াছ। আশা-মায়াবিনীর হাত হইতে ত্রাণ পাইতে চেষ্টা কর। ইতি

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন। বন্ধু কে? শত্রু কে?

উত্তর। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।

প্রশ্ন। আপন হইতে আপন কে?

উত্তর। আত্মা।

প্রশ্ন। শ্রেয় কি? প্রেয় কি?

উত্তর। শ্রেয় আত্মজ্ঞান, প্রেয় ভোগবাসনা।

প্রশ্ন। সৎপথের সাহায্যকারী কে এবং বিঘ্নকারীই কে?

উত্তর। সাহায্যকারী গুরু এবং বিঘ্নকারী আত্মীয়স্বজন।

প্রশ্ন। মানুষের কর্ত্তব্য কি এবং অকর্ত্তব্যই বা কি?

উত্তর। আত্মজ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য এবং ভোগবাসনায় ডুবিয়া থাকা অকর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। সন্ন্যাসীর কি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এবং কি কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম?

উত্তর। যে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম আর যে কর্ম্মদ্বারা সংসার রক্ষা করা হয় তাহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে —তাহা বন্ধনেরই কারণ। দেশের বা দশের জন্য যে কর্ম্ম

তাহাও আত্মজ্ঞান উপলব্ধির কোন সাহায্য করে না। সৎ চিন্তা, সৎকথা ও সত্যধ্যান—ইহাই চিত্তশুদ্ধির সাহায্যকারী প্রকৃত কর্ম্ম। সন্ন্যাসীর পক্ষে গুরুসেবা ও ধ্যান ধারণা ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই থাকিতে পারে না, কেন না সন্ন্যাসীর কর্ম্মের উদ্দেশ্য চিত্তস্থির করা কিন্তু অন্য কর্ম্মমাত্রই চিত্তের চঞ্চলতা বৃদ্ধি করে। অন্য কর্ম্মদ্বারা চিত্তের একদিকের বিকার কাটিয়া যায় কিন্তু আবার অন্য দিকের নূতন বিকারের সৃষ্টি হয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া এবং মিথ্যা জগৎ ভুলিয়া সত্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অনুভব করা। এই জন্যই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মচিন্তা ও আত্মধ্যান এবং গুরুর সেবা ও সঙ্গ করাই সন্ন্যাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন আর যে কোন কাজই সন্ন্যাসী করুক না কেন, তাহা দ্বারা তাহার চিত্তের স্থিরতা লাভ না হইয়া বরং চিত্তের চঞ্চলতাই দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে—সব সময় যখন আত্মচিন্তা করা যায় না, তখন বাকি সময়টুকু অন্য কর্ম্ম করাই ভাল। যদিও প্রথম প্রথম সব সময় মানুষ আত্মচিন্তা করিতে পারে না, তথাপি ঐ বিষয়ের বাহিরে মন না দিলে নূতন কোন বিষয়ের চিন্তা মনে স্থান পায় না। মানুষ যখন যে কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তার স্রোতই মানুষের মনে উঠাপড়া করে

এবং কর্ম্ম করার পর ধ্যান করিতে বসিলেও ঐ সকল কর্ম্মের চিত্রগুলি মনে জাগিতে থাকে।

যাহারা ধীর ও বুদ্ধিমান তাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট থাকে, কেন না এই মোহান্ধকার ঘুচাইয়া জন্মমৃত্যুরূপ যাতনা হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য গুরু পুনঃপুনঃ উপদেশ করেন। আত্মচিন্তা, আত্মধ্যান ও আত্মোপলব্ধি করার পথে একমাত্র গুরুই সাহায্যকারী হইয়া থাকেন, অন্যে নহে। ভাই, বন্ধু, স্ত্রী পুত্রাদির প্রাণে সর্ব্বদাই এক আকাঙ্খার স্রোত বহিতেছে। মোহগর্ত্তে ডুবিয়া তাহাদের ভোগ বিলাসাদি সুখ রক্ষা করা ভিন্ন তাহারা আর অন্য কিছু চাহিতে পারে না। এই জন্য সৎপথে পদক্ষেপ করিলেই তাহারাই কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আর অবিদ্যারূপ মায়াজাল ছিন্ন করার পথে গুরুই একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান।

সন্ন্যাসীর প্রথম গুরুসঙ্গ, পরে নিঃসঙ্গ। গুরুসঙ্গ কেবল বাহিরের সঙ্গকে বলা যায় না। প্রকৃত গুরুসঙ্গ অর্থ অন্তরে সর্ব্বদা গুরুর প্রতি আকৃষ্ট থাকা এবং অন্য বিষয়ে উদাসীন হওয়া। মনের আকর্ষণ না রাখিয়া অশ্রদ্ধভাবে বাহিরে সেবা করা সেবাই নহে এবং সেই সঙ্গও সঙ্গ নহে। শ্রদ্ধাবান হইয়া এবং গুরুর তি মন রাখিয়া যে সেবা ও সঙ্গ করা হয় তাহাই প্রকৃত সেবা ও প্রকৃত সঙ্গ। যে যাহাকে নিয়ত ভাবে—সে তাহারই স্বভাব পায়। যেরূপ বিষয়চিন্তা করিতে করিতে

এবং বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিতে করিতে বিষয়ভাবগুলি মানুষের মনে ফুটিয়া উঠে, সে রূপ ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে ভাবিতে ভাবিতে নিজের ভিতর সেই ব্রহ্মভাব ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। অশ্রদ্ধাবান হইয়া এবং অন্য দিকে মন রাখিয়া সারা জীবন গুরুর কাছে থাকিয়া তাচ্ছিল্যভাবে গুরুর সেবা করিয়া কেহ বিন্দুমাত্রও অমৃততত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না।

প্রঃ। গুরু ভিন্ন আত্মজ্ঞান হইতে পারে কিনা ?

উঃ। যে লোকের জন্ম হইতেই—আমি কে, জগৎ কি, কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইব এবং শান্তি কোথায়—এই সকল বিচার মনে উঠে এবং জগতের অসারতা ও অনিত্যতা পরিষ্কার ভাবে চিত্তে জাগিয়া তীব্র বৈরাগ্য আসে ও তত্ত্বানুসন্ধানে মন চলিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই গুরুছাড়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপ লোক অতি কম।

আর যে ব্যক্তি সংসারে শান্তিও পায় না এবং যাহার আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তিও নাই, তাহার ঠিক ঠিক পিপাসা কিছু জাগিলেও সে জন্মগত বাসনা কামনার অভ্যাসে আত্মতত্ত্বের পথ ধরিতে পারে না। সেই পিপাসুক এই সৎ-পিপাসাটুকু লইয়া গুরুর নিকটে গেলে বাচ বার গুরুর মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমেই তাহার পিপাসা বৃদ্ধি হয়। গুরু তাহাকে তত্ত্ব বুঝাইয়া আত্মোপলব্ধির পথ দেখাইয়া দেন। তখন সেই ব্যক্তি গুরুর তত্ত্বকথা বুঝিতে পারে

এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য চাই। উত্তম অধিকারী শিষ্যই হইর তত্ত্বোপদেশগুলি বুঝিয়া এবং তত্ত্বপথে চলিয়া এক জীবনে আত্মবোধ করিতে পারে। মধ্যম অধিকারী তত্ত্বোপদেশের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে না বুঝিতে পারিলেও, তত্ত্বপথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। অধম অধিকারীকে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশ বুঝাইয়া তত্ত্বপথ দেখাইয়া দিলেও সে বুঝিতে বা দেখিতে পারে না।

প্রঃ। সাধকের প্রকৃতি কিরূপ ?

উঃ। সাধকের প্রকৃতি স্থির, শান্ত ও ধীর হয় এবং তাহার মন সর্ব্বদা ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়।

মুখে নাহি বাক্য তার, আঁখি করে ছল ছল,
চলিতে হেলিয়া পড়ে, ভাবে সদা ঢল ঢল।

যে পর্য্যন্ত না সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে সে পর্য্যন্ত সে অন্য কোন দিকে মন দিতে পারে না বা কোন আমোদ প্রমোদেও যোগ দিতে পারে না। সর্ব্বদা তাহার মন তৈলধারার ন্যায় আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ছুটিতে থাকে। যে যখন যে বিষয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, সে বিষয় না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার মুখে হাসি আসে না এবং আমোদ প্রমোদ সব ভুলিয়া ঐ চিন্তা লইয়াই সে ডুবিয়া থাকে। সেই রূপসাধক

আত্মজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কিছুতেই শান্তি পাইতে পারে না এবং অন্য কোন কাজও তাহার ভাল লাগে না। যদি দেখা যায় কোন সাধক আমোদ প্রমোদ, হাসি কৌতুক উপভোগ করিতেছে বা আত্মচিন্তা ভিন্ন অন্য কাজে মত্ত আছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞানলাভের পিপাসা ঠিক ঠিক জাগে নাই এবং আত্মোপলব্ধি করার জন্য খাঁটি ব্যাকুলতা তাহার হয় নাই। যতটুকু পিপাসা জাগিবে ততটুকু মানুষ বিষয় বিলাসের রস ছাড়িবে এবং বিষয়কর্ম্মাদি হইতে অবসর গ্রহণ করিবে।

কেহ কেহ সাধুদের কাছে আসিয়া বলে যে তাহার মুক্ত হইতে খুবই ইচ্ছা, তবে তাহার মন ঐ দিক যায় না। যাহারা এইরূপ বলে তাহারা মুক্তির মর্ম্মই বোঝে না। মুক্তি যে শ্রেয় ইহা তাহাদের ধারণা নাই,—ভোগবাসনাই শ্রেয় বলিয়া তাহাদের প্রাণে লাগিয়া আছে। মানুষ যাহা শ্রেয় বলিয়া বুঝিতে পারে তাহার দিকে তাহার মন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। যশ, মান, ধন এইগুলি শ্রেয় মনে করে বলিয়াই মানুষের মন ঐদিকে চলিয়া যায়। যাহারা বলে "ইচ্ছা আছে, মন যায় না" তাহাদের ইচ্ছাই নাই। ইচ্ছা হইলে মন যায়। ইচ্ছা ও মন দুটী পৃথক কিছু না। প্রবল ইচ্ছা হইলে জন্মহত অভ্যাস ও সংস্কারগুলি সেই সদিচ্ছার নূতন অভ্যাসের দ্বারা আপনা হইতেই চলিয়া যায়। যেমন

চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমুদিনী বিকসিত হইয়া থাকে, যেমন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নলিনী প্রস্ফুটিত হয়, তেমন সদিচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে। চন্দ্র বা সূর্য্য উদিত না হইলে যেমন কুমুদিনী বা নলিনী ফুটে না, সেইরূপ সদিচ্ছা না জাগিলে আত্মজ্ঞান ফুটিতে পারে না। যেমন তৃষিত চাতকের পিপাসা বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জলে মিটে না, তেমন তত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তি আত্মচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কাজেই শান্তি পায় না এবং তাহার মন ও অন্য কাজে যায় না।

প্রঃ। মহাপুরুষেরা কাহারও প্রতি কৃপা করেন এবং কাহারও প্রতি কৃপা করেন না, কাহারও প্রতি বেশী কৃপা এবং কাহারও প্রতি কম কৃপা করেন—এইরূপ হয় কেন?

উঃ। মহাপুরুষেরা সব সময়ই স্থির থাকেন। কাহারও প্রতি দয়া বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন না। যার যার কর্ম্মফল অনুসারে তাঁহাদের দয়া ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। যেমন সূর্য্য একভাবেই থাকে, কিন্তু পাত্রভেদে সূর্য্যের কিরণ কম বেশী প্রকাশ পায়, নিজে ইচ্ছা করিয়া কোথাও বেশী কিরণ বা কম কিরণ দেয় না, সেইরূপ মহাপুরুষদের দৃষ্টি সর্ব্বত্রই সমান, যার যার কর্ম্ম অনুসারে লোক কমবেশী কৃপার অধিকারী হয়। যেরূপ আবৃত স্থানে সূর্য্যের কিরণ মাত্রই পড়ে না

সেইরূপ যাহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মায়ামোহে আচ্ছন্ন থাকে তাহাদের উপর মহাপুরুষদের কৃপা মাত্রই প্রকাশ পায় না।

প্রঃ। মানুষ মহাপুরুষের কৃপা পাইয়াও কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় কেন ?

উঃ। মানুষ শুভ ইচ্ছার ফলে মহাপুরুষের কৃপা পায়, আবার অশুভ কর্ম্মের ফলে সেই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রঃ। মহাপুরুষ যদি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিতে থাকেন তবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা দ্বারা তুষ্ট এবং অশ্রদ্ধাদ্বারা রুষ্ট হইতে দেখা যায় কেন ?

উঃ। তিনি কাহারও প্রতি রুষ্ট বা তুষ্ট হন না—সর্ব্বদাই এক ব্রহ্মভাবে ডুবিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মভাব হইতে শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা দ্বারা কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি সকল সময় নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে তাহার অন্তরে সেই মহাপুরুষের পবিত্রভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে এবং অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সেই ভাব হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ে। তাহাই বাহির দৃষ্টিতে কাহারও প্রতি তুষ্ট এবং কাহারও প্রতি রুষ্ট হওয়া দেখা যায়। যেমন অগ্নিতে বারি সিঞ্চন করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু সেই অগ্নিতেই ঘৃত নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা পবিত্র ব্রহ্মভাবের আভাস প্রকাশ পাইতে থাকে এবং অশ্রদ্ধা দ্বারা তাহা লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রঃ। 'কোন মহাপুরুষকে যদি কেহ কোনরূপ অত্যাচার করে তবে তাঁহার সেই ব্রহ্মভাব হইতে তিনি বিচলিত হন কি না ?

উঃ। তাঁহাকে কেহ অত্যাচার করিলে তিনি বিচলিত হন না, তিনি এক ভাবেই থাকেন, কেন না তিনি জানেন তিনি দেহ না, দেহাতীত নিরঞ্জন আত্মাস্বরূপ। সেই নিরঞ্জন আত্মাস্বরূপকে কেহ অত্যাচার করিতে পারে না। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিতে পা দিয়া চাপা দিলে অগ্নির কিছুই হয় না, যে পা দেয় তাহার পা পুড়িয়া যায়, তেমন যে ব্যক্তি তাঁহাকে অত্যাচার করে, সেই অত্যাচারের ফল সে নিজেই ভোগ করে।

প্রঃ। মৃত্যু অবস্থা কি ?

উঃ। সমস্ত বাসনা কামনা বুদ্ধিবৃত্তি এবং দেহজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ভাবগুলি যখন এত সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে তাহা লয় না হইলেও লয়ের মতই হয়, সেই অবস্থাকে মৃত্যু বলে। আবার যখন এই সকল ভাবগুলি বিকাশ পাইতে থাকে সেই অবস্থাকে জন্ম বলে। এই বিকাশ নিজের পূর্ণ বিকাশ নহে, ইহা বাসনা কামনাযুক্ত যে সঙ্কুচিত মন সেই মনের বিকাশ মাত্র। বর্ত্তমান দেহে যে যেরূপ কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মফল অনুসারেই জন্ম হইয়া থাকে। কর্ম্মফল অনুসারে দেবলোকে নরলোকে এবং পশুকুলেও জন্ম হইয়া থাকে।

এই উভয় অবস্থার পরিবর্ত্তনের সময় জীব কষ্ট পায় তাহাই জন্ম ও মৃত্যুযন্ত্রণা। জন্ম মৃত্যু ভ্রান্তিমাত্র। যতদিন না মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে ততদিন সে জন্মমৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে থাকে। কোন লোক মদ খাইয়া মদের নেশায় দেখে সে যেন সুন্দর এক মনোরম স্থানে বাস করিতেছে এবং ইহা মনে করিয়া সুখ পাইতেছে, আবার কখনও দেখে যে ঘোর এক নরকে পড়িয়া অনেক দুঃখ যাতনা পাইতেছে, কখনও দেখে যে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, কখনও দেখে যে বৃহৎ হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু যখন তাহার মদের নেশা ছুটিয়া গেল তখন দেখে যে স্বর্গেও নাই, নরকেও নাই, সে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয় নাই—সে যাহা ছিল তাহাই আছে,—তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেইরূপ মানুষ বিষয়বিষসুরাপানে মত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া কখনও জন্মযাতনা, কখনও মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতেছে, বলিয়া বোধ করিতেছে, কখনও সুখী এবং কখনও দুঃখী বোধ করিতেছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ কিছুই হইতেছে না—এই সকলই তাহার মনঃকল্পিত—ইহার কোনটারই প্রকৃত সত্তা নাই।

জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা যেমন মানুষের নিয়ত হইতেছে, তেমন মৃত্যুও জন্মরূপ সঙ্কোচ ও বিকাশ—এই দুইটী অবস্থাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ মোহমায়ায় বদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে এই মোহ অন্ধকারে

ডুবিয়া নানারূপ অবস্থার ঘুর্ণীপাকে ঘুরিতে থাকে। যখন মানুষের বিষয়তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হয়, তখন হৃদয়াকাশ হইতে মায়ামেঘগুলি সরিয়া জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ হইতে থাকে। যখন জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয় তখন সে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জন্ম ও মৃত্যু এই অবস্থাগুলি হইতে শান্তি পাইতে পারে। তখস সে বুঝিতে পারে যে কখনও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই—সে যাহা ছিল তাহাই আছে।

প্রঃ। সংসার বজায় রাখিয়া মুক্তিলাভ করা যায় কিনা?

উঃ। খাঁটি বুঝ আসিলে কেহই সংসারে থাকিতে পারে না। কামনা না থাকিলে সংসার করার প্রয়োজন কি? যাহারা বলে নিষ্কামভাবে সংসারে আছে, তাহাদের কামনা আছে। 'নিষ্কামভাবে সংসার করি' বলা ফাঁকি কথা।

প্রঃ। এ জগতে যাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দেখা যায় না কেন?

উঃ। এ জগতের বুঝ হইতে আধ্যাত্মিক জগতের বুঝ পৃথক। বৈষয়িক ব্যাপারে যাহাদের জ্ঞান আছে, ধর্ম্মের বিষয়েও যে তাহাদের জ্ঞান থাকিবে এমন কোন কথা না। বিয়য়াসক্ত ব্যক্তিরা এ জগতের ব্যাপারে জগৎটাকেই সার ভাবে, তাই তাহারা ধন, মান ও যশের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। আর ধর্ম্মের জ্ঞান হইতেছে গভীর জ্ঞান—অন্তর্দৃষ্টি সংযুক্ত। সেই

জ্ঞান আসিলে বেশ বুঝা যায় ধন, মান ইত্যাদি নিতান্ত অসার ; সেই জ্ঞানের অপর নাম বৈরাগ্য।

প্রঃ। পিতা মাতা জীবিত থাকিতে ও পিতৃমাতৃঋণ শোধ না করিয়া লোক সন্ন্যাসী হইতে পারে কি না ?

উঃ। অনেকে বলে পিতৃমাতৃঋণ শোধ করিতে হইবে। কিন্তু পিতা মাতা ত প্রত্যেক জন্মেই থাকিবে এবং পিতৃমাতৃঋণ শোধ করিবার জন্য যদি সংসারী হইতে হয় তবে লোক মুক্তি পাইবে কেমন করিয়া ? অতএব কোন ঋণের দিকে না চাহিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আর খাঁটি বিচার আসিলে দেখা যাইবে পিতামাতার কাছে লোক মোটেই ঋণী না,—মুক্তি কামীর কোন ঋণ নাই। অন্য কোন দিকে না চাহিয়া যাহাতে নিজের মুক্তি হয় সেই ভাবেই চলা উচিত।

প্রঃ। সংসারীদের ভালবাসা ঠিক কিনা ?

উঃ। সংসারী লোকের ভালবাসা লোকের রুইমাছ ভাল বাসার মত। একটা বড় রুইমাছ ছুটিয়া গেলে সকলে বলে 'আহা' সেইরূপ একজন মুক্তিপথে যাইতে আরম্ভ করিলে তাহার আত্মীয় স্বজন হাহাকার আরম্ভ করে।

প্রঃ। মুক্ত হইতে ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু সংসার চলে কি করিয়া ?

উঃ। মুক্তির প্রকৃত ইচ্ছা হইলে কোন ঠেকা মনে হয় না। লোকের যত বাধা, যত ঠেকা, মুক্তি পথে যাওয়ার সময়। কেহ

চিরজনমের তরে রুগ্ন হইলে বা কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার সংসার কি আর চলে না? নিজের মুক্তির জন্য যদি প্রবল ইচ্ছা হয়, তবে সংসার চলা না চলা সম্বন্ধে তাহার কোন বিচারই আসে না।

প্রঃ। ধ্যান ধারনা করিতে এত পরিশ্রম হয় কেন?

উঃ। লোকের মনে সর্ব্বদাই কোন না কোন চিন্তা থাকে, কিন্তু সেই চিন্তার জন্য তাহার কোন পরিশ্রম বোধ হয় না কারণ সেই চিন্তা তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ ধর্ম্মচিন্তাতে লোক যখন অভ্যস্ত হয় তখন তাহার কোন পরিশ্রম বোধ হয় না।

প্রঃ। আমাদের দুঃখ দূর হইবে কিনা এবং কি উপায়ে দুঃখ দূর হইবে?

উঃ। সব রোগেরই, সব দুঃখেরই প্রতীকার আছে। ঐ রোগ হইতে, ঐ দুঃখ হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা আসিলেই কি উপায়ে রোগ, দুঃখ দূর হইবে, তাহা বুঝা যাইবে। আগে চাই তীব্র ব্যাকুলতা।

প্রঃ। মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক কি?

উঃ। কাম ও যশই মুক্তি পথের প্রধান প্রতিবন্ধক।

প্রঃ। কাহারও যদি টাকা রোজগারের দিকে মন থাকে, অন্যদিকে মন না থাকে, তবু কেন তাহার মনের উন্নতি হয় না?

উঃ। এক প্রকারের ভোগাকাঙ্খা আছে এইরূপ দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রকারের ভোগাকাঙ্খাই তাহার থাকে। কাহার ও টাকার প্রতি মন থাকিলে তাহার নিশ্চয়ই কামের প্রতি ও যশের প্রতি মন আছে। কাম, কাঞ্চন ও যশ— এই সব একত্রে থাকে। এ সকলের একটা একটা করিয়া ত্যাগ করা যায় না। যদি কেহ বাস্তবিক এ সব ত্যাগ করিতে চায় তবে তাহাকে এই সবগুলি এক সঙ্গে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রঃ। মুক্তিলাভ করিতে হইলে আত্মীয় স্বজনের মায়া ত্যাগ করার প্রয়োজন কি? ইহাত সামান্য বন্ধন মাত্র।

উঃ। কাম ও যশের ন্যায় পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর প্রতি মায়াও বিষম বন্ধন এবং মুক্তিপথে এক অতি প্রবল অন্তরায়। অনেকস্থলে কাম ও যশের চেয়েও মায়া বেশী বিঘ্ন ঘটায়। যে ধর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয় তাহাকে যদি কোন মহাপুরুষ বলেন যে, "এস তোমার কাম প্রবৃত্তি দূর করিয়া দেই" তবে সে আনন্দিত হয়; কিন্তু যদি বলেন "এস তোমার মায়া দূর করিয়া দেই" তবে তাহার মুখ বিষন্ন হইয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় মায়ার এমনই মায়া যে, ধর্ম্ম করিতে গিয়াও লোক বুঝিতে পারে না ইহা কত অনিষ্টকারী ও সর্ব্বনাশ-কারী। কাম, যশ ও মায়া সম্পুর্ণরূপে ত্যাগ না হইলে ধর্ম্ম হইতেই পারে না।

প্রঃ। যাহারা মুক্তিপথে চলে লোকে তাহাদিগকে মন্দ বলে কেন ?

উঃ। এ জগতে যাহারা ভাল তাহারা ঐ (আধ্যাত্মিক জগতে মন্দ। এ জগতে যাহা গুণ তাহা ঐ জগতে দোষ। এ জগতে যাহাদের বেশী মায়া আছে তাহারা প্রশংসা পায়, যাহারা আত্মীয়স্বজনের প্রতি বেশী অনুরক্ত তাহাদিগকে সকলে ভালবাসে। কিন্তু যাহাদের এইরূপ বেশী মায়া, বেশী আশক্তি আছে, তাহারা সহজে ধর্ম্মজগতে যাইতে পারে না। এ জগতে যাহারা নাম যশকে বড় জিনিষ মনে করিয়া, নাম যশের জন্য খুব বেশী চেষ্টা করে, এ জগতের লোক তাহাদিগকে ভাল লোক মনে করে। কিন্তু যাহারা নাম যশকে অতি তুচ্ছ জিনিষ মনে করে, কেবল তাহারাই মুক্তিপথে যাইতে পারে।

প্রঃ। অহঙ্কার ও অহম্ভাবে পার্থক্য কি ?

উঃ। অহঙ্কার ও অহম্ভাবের পার্থক্য এই যে, মানুষের মনে অহঙ্কার হইলে, বৃথা আমিত্ব নিয়া অপর সকল হইতে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যশ মান ও নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আকাঙ্খা করে। অহম্ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অহম্ভাব হইলে মন গলিয়া যায়, নিজেকেই সর্ব্বময় বোধ হয়, কাহার ও পৃথক সত্তা থাকে না। একমাত্র আমিই আছি —এই জ্ঞান হয় ভেদজ্ঞান থাকে না।

প্রঃ। মানুষের মনে দুর্ব্বলতা আসে কেন ?

উঃ। আশা ছাড়িতে পারে না বলিয়াই দুর্ব্বলতা আসে। আশা ছাড়িতে পারিলে দুর্ব্বলতা আসিতে পারে না। আশা নষ্ট হইবে এই আতঙ্কেই দুর্ব্বলতা মনে আসে। সকল আশা ত্যাগ হইলে মনে কোন দুর্ব্বলতা আসিতে পারে না। আশাই মানুষকে দুর্ব্বল করে।

প্রঃ। মানুষের স্বরূপ কি ?

উঃ। জ্ঞান হইলে বুঝিবে তোমরা সকলেই বিরাট—কেহই ক্ষুদ্র না। ভুলে ক্ষুদ্র হইয়া রহিয়াছি। নিজেকে ক্ষুদ্র মনে কর বলিয়াই ক্ষুদ্র হইয়াছ। তোমরা মনে কর তোমরা দেহ,—বাস্তবিক তোমরা দেহ ও না, মন ও না, তোমরা বিরাট আত্মা। দেহ, জগৎ সকলেই তোমরা মনের তৈয়ারী। তোমরা মনে কর তোমরা ক্ষুদ্র—সাধন দ্বারা এক বিরাট ভাবে মিশিয়া যাইবে,—প্রথমতঃ এইরূপ ভাবই আসিবে। বস্তুত তোমরা নিজেই বিরাট আত্মা।

প্রঃ। গেরুয়া না পরিয়া লোক মুক্তিলাভ করিতে পারে কি না।

উঃ। ধর্ম্ম হইতেছে মনের। গেরুয়া না পরিয়াও লোক মুক্ত হইতে পারে এবং গেরুয়া পরিয়াও লোক খারাপ হইতে পারে। আগে চাই মন পরে বাহিরের সাহায্য। মন ভাল হইলে গেরুয়ায় যেমন বাহিরের কিছু সহায়তা করে

মন খারাপ হইলে তেমন গেরুয়া দ্বারা ভণ্ডামির সহায়তা হয়। যাহার অন্তর সুন্দর সেই সুন্দর, বাহির সুন্দর হইলে কোন লাভ নাই।

প্রঃ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উঃ। চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া বৈরাগ্যলাভের চেষ্টাই ধর্ম্ম। মুক্তি ধর্ম্ম অধর্ম্মের বাহিরে।

প্রঃ। লোকালয় ছাড়িয়া বনে গেলে সংসার ছাড়া হয় কি না ?

উঃ। সংসার হইতেছে মনে। বনে গিয়াও যদি সংসারের আসক্তি মনে থাকে তবে বনেই তাহার সংসার। আর সংসারে থাকিয়াও যদি আসক্তি না থাকে তবে লোকালয়ই তাহার পক্ষে বন।

প্রঃ। তবে লোকালয় পরিত্যাগের দরকার কি ?

উঃ। যাহারা সংসারে থাকে তাহাদিগকে পরিবারস্থ লোকেরা বাধা দেয়। পরিবারস্থ লোকের বাধা বিঘ্ন হইতে সরিয়া তাহারা নির্জ্জনে গিয়া থাকিয়া বিষয়াসক্তি মন হইতে দূর করিবার সুবিধা পায় এবং সৎ অভ্যাস দ্বারা তাহাদের বিষয়া-সক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। বিষয় কর্ম্ম, বিষয় সঙ্গ, বিষয় আলাপন ও বিষয় কথা শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা বিষয়াসক্তি না কমিয়া

বরং ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া যায়। এই জন্যই বাহিরের ত্যাগ করিয়া অন্তরের ত্যাগের জন্য নির্জ্জনতার দরকার।

প্রঃ। সংসারীর কর্ত্তব্য কি?

উঃ। সংসারীর কর্ত্তব্য নিজের ও স্ত্রীপুত্রের ভোগবিলাস লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া সমস্ত পরিবারের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টি রাখা এবং পাড়াপ্রতিবেশীর যথাসাধ্য সাহায্য করা; নিজের স্ত্রীপুত্র লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, সকলের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হওয়া। পরের অনিষ্ট করা ত দূরের কথা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও যাহাতে মনে স্থান না পায় তাহা করা এবং পরের সুখ শান্তি দেখিয়া তাহাদিগকে হিংসা না করা সংসারীর কর্ত্তব্য। হিংসা দ্বারা লোক নিজেও জ্বলে এবং পরকে জ্বালায়। কেহ হিংসা করিলেও তাহাকে হিংসা করিবে না, কিম্বা তাহার অনিষ্ট করিবে না। যে অন্যায় কর্ম্ম করে সে নিজেই তাহার ফল ভোগ করে। সর্ব্বদা নিরহঙ্কার হইতে চেষ্টা করিবে। সংসার যে সার এবং সংসার যে চির শান্তির স্থান ইহা মনে করিবে না। এই ভাব মনে না রাখিলেই হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারাদি ক্রমেই দূর হইতে থাকিবে। মানুষ যতই উদার ভাবে চলিবে, ততই তাহার মনের সঙ্কীর্ণ অন্ধকারের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং চিত্ত প্রশস্ত হইয়া সত্য আলোকের আভাস পাইতে থাকিবে। সংসারে থাকিয়া গুরুজনের প্রতি

শ্রদ্ধাভক্তি এবং কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ ভালবাসা দেখাইবে। দেবদেবীর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব না করিয়া বরং সংসারীদের দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করাই ভাল। সংসারে যে যত উদার চিত্ত হইবে এবং যার যতদূর শ্রদ্ধাভক্তি থাকিবে পরজন্মে ততদূরই তার মঙ্গল হইবে। যে যত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া সংসারে মত্ত থাকিবে, সে তত অন্ধ হইতে অন্ধতর লোকে যাইবে। একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড একটী বৃক্ষ হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাভক্তি হইতে চেষ্টা দ্বারা মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারে। আবার ক্ষুদ্র একটী পাপের বীজ হইতে ক্রমে মানুষের পতনের শেষ সীমায় লইয়া তাহাকে বিষ্ঠার কীট ও করিতে পারে।

যাহারা সংসারী তাহারা সকলের প্রতি দয়াবান থাকিবে আর যাহারা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাহারা না দয়াবান না নিষ্ঠুর এই ভাবে অর্থাৎ উদাসভাবে নিজ মুক্তি সাধন করিবে। সমস্ত সংসারীরই এই অনিত্য সংসারকে সার না ভাবিয়া তাহা হইতে পৃথক যে এক চির শান্তির স্থান আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সংসারে প্রবাসীর মত থাকা কর্ত্তব্য। সংসারীর সমস্ত লোকের সুখ দুঃখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে এবং যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চায় তাহারা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া এবং সকল ত্যাগ করিয়া যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে সেই পথে চলিয়া যাইবে।

প্রঃ। পাপ এবং পূণ্য কি ?

উঃ। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, অহঙ্কার—এই সকলের বশীভূত থাকাই পাপ। হিংসাদ্বেষ বর্জ্জিত ও কামনাশূন্য হইয়া পরোপকার ও দানদক্ষিণা করা এবং নিরহঙ্কার হইয়া পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়াই পুণ্য।

মুক্তিকামার পক্ষে পাপ ও পুণ্য উভয়ই বর্জ্জনীয়। পাপ দ্বারা মানুষ ক্রমেই পশু কীট, পতঙ্গাদি যোনি গ্রহণ করে, আবার পুণ্য দ্বারা পুণ্যফলে সুখস্বর্গাদি পায়। এই পুণ্যফল জন্য ভোগ চিরস্থায়ী নহে। ফল ভোগ শেষ হইলে আবার সে অন্ধকারময় দুঃখে পতিত হয়। পাপ ত্যাগ করিয়া পুণ্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করিয়া যাহারা আত্মনুসন্ধানের পথে চলিয়া যায় তাহারাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং জন্মমৃত্যু যাতনা হইতে শান্তি পায়।

প্রঃ। মানুষ কি সাধন করিলে এবং কাহাকে সাধন করিলে সকল দুঃখ জ্বালা হইতে ত্রাণ পাইয়া পূর্ণ শান্তি পাইতে পারে ?

উঃ। পরমব্রহ্মকে সাধন করিয়া ব্রহ্মস্বরুপ হইতে পারিলে সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মানুষ পূর্ণ শান্তি পায়।

মায়া।

প্রশ্ন। মায়া কি? মায়ার অর্থ কি?

উত্তর। মায়ার অর্থ কুহক। যাহার যথার্থ অস্তিত্ব কিছুই নাই, অথচ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই মায়া। এই অর্থে মায়ার অর্থ 'ভুল' বা 'মিথ্যা'; ইহাই মায়ার প্রকৃত অর্থ। সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায়, কায়াতে ছায়ার ন্যায়, মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায়, ব্রহ্মে মায়া অধ্যাসিত রহিয়াছে। কোথা হইতে মায়া আসিল, কেন মায়া হইল এইরূপ প্রশ্নের উত্তর নাই। মাতাল যেরূপ মদের নেশায় কত কিছু দেখে, অথচ মত্ততা চলিয়া গেলে কিছুই দেখে না, জীবও সেইরূপ অবিদ্যা-হেতু আশার কুহকে বাসনা দ্বারা চঞ্চল হইয়া জগৎরূপ মরীচিকা দেখিতেছে। মায়া ত্যাগ হইলে মায়া ছিল বলিয়া বোধ থাকে না। সুতরাং মায়া কিরূপে হইল তাহার কোন উত্তর নাই। তবে ভুলে মায়া দেখা যায়। মায়াতে কেবল অনর্থজাল বিদ্যমান। মায়াতেই সুখ দুঃখ বর্ত্তমান দেখা যায়। বাস্তবিক সুখও নাই দুঃখও নাই। সুখের আশাতেই জীব ঘুরিতেছে। আশার পিপাসা মিটেনা। রাত্রিবেলা আলেয়া দেখা গেলে, তাহা ধরিতে গিয়া যেমন তাহা ধরা যায় না,

কেবল বৃথা চেষ্টা করা হয়, তেমন মায়ার রাজ্যে সুখ পাইবার আশায় জীবসকল ঘুরিতেছে, কিন্তু মায়া মিথ্যা ও মনকল্পিত বলিয়া তাহাতে শান্তি হয় না। মায়া ঘুচিলেই শান্তি পাওয়া যায়।

আরও বিস্তারিত ভাবে মায়ার রহস্য বুঝা যাউক। জীব মাত্রই ব্রহ্ম হইতে জাত,—জীব মাত্রই ব্রহ্ম—অথচ ভ্রমে মায়াতে জীব বলিয়া ধারণা জন্মিয়া রহিয়াছে। ইহাই মায়া। জীব প্রতিনিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তথাপি মানুষ মাত্রই মরিবেনা বলিয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—ইহাই মায়া। মানুষের দেহ, অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দেহ মৃত্যুর পর শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, অথচ দেহই সত্য, দেহই সুখের প্রশ্রবণ এইরূপ ধারণাই মায়া। সেইরূপ যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই মায়া, যেহেতু যাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই, যাহা মনের তৈয়ারী তাহাই মায়া। এই জগৎ মনের কল্পনাজাত, যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, ভোগ করা যায়, সকলের সত্তাই মনের কল্পনাপ্রসূত। মন না থাকিলে এ সকলের অস্তিত্ব থাকেনা। নিদ্রার সময় এ সকল থাকে না, সুতরাং এসকই মিথ্যা মায়া। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আছে বলিয়া মানুষের প্রতীতি জন্মায়, অথচ বিদ্যমান থাকেনা, তাহাই মায়া। দেহ একটী জড়পিণ্ড মাত্র, সুতরাং ইহা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। একমাত্র

চৈতন্যময় আত্মাই শান্তিস্বরূপ। দেহ সুখ দান করে ইহা মনে করাই মায়া। মানুষের প্রত্যেক দৈহিক ইন্দ্রিয় ইট্‌পাটকেলের মত মাত্র, তবু মানুষ মনে করে ইহারা সুখদাতা। নিজের আত্মস্বরূপ ভুলিয়া বহির্মুখী হইয়া জন্মগত অভ্যাস নিবন্ধন এইরূপ ধারণা করার নামই মায়া। জীব মাত্রই দেহ নহে, সেই চিদানন্দস্বরূপ, অথচ জন্মগত অভ্যাস নিবন্ধন "আমিই দেহ" এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাই মায়া। যাহা কিছু মনকল্পিত তাহাই মায়া। যাহা মানুষকে সুখ দিতে পারে না, অথচ দিবে বলিয়া প্রলোভন দেখায় তাহাই মায়া। দর্পনে প্রতি-বিম্বিত মূর্ত্তি যেরূপ সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ ও তজ্জাত ভোগসুখ সত্য নহে, প্রকৃত শান্তিদাতা নহে, অথচ মরুভূমিতে তৃষ্ণাতুর মৃগের মত বাসনাতুর জীবের মনে তৎসকল সত্য ও সুখপ্রদ বলিয়া যে বোধ হয় তাহাই মায়া। যে সুধীর ব্যক্তি বিবেকবিচার বলে মায়ার রহস্য ভেদ করিতে পারে এবং একমাত্র বিদ্যমান আত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়া মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারে, সেই শান্তি পাইতে পারে, সেই অমৃত হয়, সেই ব্রহ্ম হইতে পারে।

যেরূপ নিদ্রিতাবস্থায় দেহ ও তৎসম্পর্কিত ভোগের জিনিষ-পত্র সকলই বর্ত্তমান থাকিলেও দেহী তাহা জানিতে পারে না, ঘুমঘোরে থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মই মায়ামোহরূপ ঘোরে স্ব-ভাব ভুলিয়া দেহঘোরে নিজকে দেহী ভাবিয়া বদ্ধ না থাকিলেও

বদ্ধ রহিয়াছে বোধ করিতেছে। চেতন হইলে দেখা যায়—আমি ব্রহ্মময়, আমা হইতেই এ জগৎ সৃষ্টি,—জগৎ আমারই কল্পনা,—যেমন সমুদ্রের বুদ্বুদ সমুদ্র হইতে পৃথক নহে।

যেমন কোন বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া ঘুরিতে থাকিলে সমস্ত ঘর, বাড়ী, মানুষ, গাছ ঘুরিতেছে বলিয়া দেখা যায়, তাহাদের আকার অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে মনে হয়, তেমন কল্পনাতে আত্মা চঞ্চল হইয়া জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছে; বাস্তবিক ইহা মায়ামূলক—মনের তৈয়ারী, কামনা দ্বারা চঞ্চল মনের বিকারপ্রসূত। বিবেকবলে অন্তর্দৃষ্টি হইয়া কামনা নাশ হইলে মন স্থির হয় এবং আত্মার বিরাটস্বরূপ উপলব্ধি হয়; তখন সমস্ত ভ্রম দূর হয় ও একমাত্র চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান থাকেন। আত্মা সত্য; তাঁহার ঘূর্ণিত, তরঙ্গায়িত অবস্থারূপ জগৎপ্রপঞ্চ মায়া বিকৃত। শরীরপ্রপঞ্চ মনের তৈয়ারী; মানসিক ও দৈহিক দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি করিলে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান থাকেন।

প্রঃ। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব? আগে কি, পরে কি, মধ্যে কি, দেহ কি ও মন কি?

উঃ। তুমি দেহ না, দেহজাত ইন্দ্রিয়াদিও না; কারণ এই সকল জড়পদার্থ। তুমি এই সকল হইতে পৃথক, চৈতন্যময় বিরাট আত্মা। তুমি ভুলে দেহে আবদ্ধ রহিয়াছ, মোহমায়ার ভ্রমে দেহরূপ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাতে সুখ আছে

মনে করিয়া ঘুরিতেছ; আশার বিকারে দেহ তৈয়ারী করিয়া ভ্রমে নিজকে জীব বলিয়া ধারণা করিয়া রহিয়াছ। তুমি দেহ হইতে পৃথক, আকাশসদৃশ, চৈতন্যময় একমাত্র আনন্দ-স্বরূপ আত্মা। কুকুর যেরূপ শুষ্ক গো-অস্থি দন্ত দ্বারা কামড়াইতে কামড়াইতে নিজমুখ হইতে রক্ত নির্গত করিয়া তাহা লেহন করিয়া মনে করে অস্থি খুব সুমধুর, তদ্রূপ যদিও তুমিই এক মাত্র আনন্দস্বরূ, তথাপি দৈহিক ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার সময় তোমা হইতে সুখ নিয়া ঐ সকলকে সুখদাতা মনে করিতেছ। এই ভ্রম বুঝিয়া একমাত্র তোমাতে তুমি থাকিলে বোধ করিবে তুমিই আত্মাস্বরূপ আনন্দময়। তুমি দেহ না, ইন্দ্রিয়সুখলিপ্ত মন ও না—তুমিই ব্রহ্ম।

তুমি কোথা হইতেও আস নাই, কোথায়ও যাইবে না। তুমি স্থির ও সর্ব্বব্যাপী; ভ্রমে দেহজ্ঞানে আসা যাওয়া বোধ করিতেছ। দেহজ্ঞান দূর হইলে তুমি নিজস্বরূপে থাকিবে।

মধ্য অবস্থায় কেবল তুমি জীব বলিয়া ধারণা করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছ। মধ্য অবস্থাই ব্যক্ত দেখিতেছ, তোমার পূর্ব্ব ও নাই, পর ও নাই, সুতরাং মধ্যও নাই। যেহেতু পূর্ব্বে তোমার জগৎপ্রপঞ্চ ছিল না, পরেও থাকিবে না, সুতরাং এখন যে আছে তাহা ভ্রমেই বোধ করিতেছ। যাহা পূর্ব্বে ও পরে নাই তাহার জন্য আপশোষ কি? তুমি পূর্ব্বেও যাহা এখনও তাহা, পরেও তাহা, তুমি কালাতীত ব্রহ্মস্বরূপ।

তোমার দেহ একটী জড়পিণ্ড মাত্র—জড়পদার্থ, মনের বিকারজাত। মনের চঞ্চলতায় মনে কোন ধারণা সূক্ষ্মাকারে জন্মিয়া তাহাই স্থূলভাবে পরিণত হয়। যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্প মনে হওয়াতে তাহা সর্প বলিয়া দৃষ্ট হয়, তেমন মনে কতকগুলি গুণ বর্ত্তমান হইলে তদনুসারে জড়পদার্থ দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্য প্রস্থ, কাঠিন্যাদি গুণ মনে উদিত হইলে একখণ্ড কাষ্ঠ মনে হয়, তদ্রূপ দৈহিক গুণ মনে উদিত হইয়া তাহা গাঢ় হইয়া দেহ দৃষ্ট হয়। দৈহিক কামাদিসুখের ভ্রমে দৈহিকগুণ মনে উদিত হইয়া জলে বুদ্বুদের মত দেহ দেখা যাইতেছে; মনই দেহ তৈয়ারী করিয়াছে। দৈহিক বহির্মুখী সুখে লিপ্ত আত্মার চঞ্চল অবস্থাই মন। মন দৈহিক ভুল হইতে অন্তর্মুখী হইয়া স্থির হইলেই আত্মার উপলব্ধি হয়। তুমি সেই আত্মাস্বরূপ। তুমি আত্মা অথচ ভ্রমে মন ও দেহ ইত্যাদি বলিয়া নিজকে মনে করিতেছ। ইহাই মোহমায়া।

প্রঃ। মোহ কি, মোহনিদ্রা কি ?

উঃ। যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব বোধ করাই মায়া। মায়ার বশে ভুলিয়া আত্মতত্ব না জানার নাম মোহ। জগৎপ্রপঞ্চ ও দেহ এবং দৈহিক সুখ মনজাত, সুতরাং অস্থায়ী ও মিথ্যা এইরূপ না বুঝিয়া ইহাই সত্য বুঝার নাম মায়া। মিথ্যা বস্তুতে সত্যবোধরূপ ভ্রান্তিকে মায়া বলে। তাহাতে আসক্ত হওয়াকে মোহ বলে এবং মোহের গাঢ়ত্বকেই মোহনিদ্রা বলে।

প্রঃ। আমি দেহ মন হওয়ার কারণ কি? চৈতন্য হওয়া কি? স্বরূপ কি?

উঃ। তুমি দেহ বা মন না; তোমার দেহ মন নাই, ভুলে তাহা বোধ করিতেছ। তুমি দেহ মন এইরূপ মনে কর বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে—মনে না করিলে কিছু থাকে না। তুমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মময়। তুমি আনন্দময় অহংভাব। তোমার অহংভাবের বিকৃতভাবে খণ্ডজ্ঞানে অহঙ্কার ও আমিত্বজ্ঞান হইয়াছে; তোমার আনন্দস্বরূপ বিকৃত হইয়া কামাদি বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। এই কামাদিতৃষ্ণায় খণ্ডজ্ঞানে নিজকে দেহ বোধ করিয়া দেহরসে মত্ত হইয়া মরুভূমিতে তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় তুমি নিজস্বরূপ ভুলিয়া ঘুরিতেছ। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিয়া তুমি সকল ভ্রমের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ ধারণা লাভ করার নাম চৈতন্য হওয়া।

চৈতন্যলাভ হইলে, সাধন দ্বারা নিজকে দেহ হইতে পৃথক বোধে আত্মসুখে রত থাকিলে, দৈহিক কামনাদি নষ্ট হয় এবং অখণ্ড অহংভাব দ্বারা খণ্ডজ্ঞান লোপ হইলে অহঙ্কার দূর হয়। তুমি তখন একমাত্র আনন্দ স্বরূপ।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম মীমাংসা ।

ধর্ম্ম অধর্ম্ম দুইটী কথা অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কথা দুইটী কি ? দুইটী ভাব, একটী সত্যের ভাব, আর একটী অসত্যের ভাব। সত্যের ভাবকে ধর্ম্ম বলা হয় এবং অসত্যের ভাবকে অধর্ম্ম বলা হয়। যাহা নিত্য স্থায়ী সেই ভাবই ধর্ম্ম, আর যাহা অস্থায়ী, অনিত্য, সেই ভাবই অধর্ম্ম। যাহা নিত্যস্থায়ী সেই আনন্দ পাইতে সকলের প্রাণেই কিছু না কিছু আকাঙ্খা আছে—যে যাহাই করিতেছে সে তাহা আনন্দ পাইবার জন্যই করিতেছে। কিন্তু সেই আনন্দ যে কোথায় আছে তাহা ভুলিয়া যশ, মান, ধন ইত্যাদিতে সুখ আছে ভাবিয়া তাহা নিয়াই কেহ কেহ আছে ; আবার কেহ বা তীর্থ, ব্রত, দান, দক্ষিণা নিয়ে আছে। সকলের উদ্দেশ্যই সেই অমৃত লাভ করা, সকলেই সেই অমৃততত্ত্ব লাভের জন্য এই সব করিতেছে। সকলেই ধর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপথ ভুলিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ—এই সব যে কি তাহা বিচার করিতে না পারিয়াই মানুষ

চারিদিকে সেই আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভুলে পড়িয়াই এই জগতে এত কষ্ট দেখিতেছে, তাহা না হইলে জগৎ বলিয়াই কিছু থাকিত না। সুখ দুঃখ যাহা দেখা যাইতেছে সবই ভুলে। মানুষ নিজেকে ভুলিয়া সুখ দুঃখের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। নিজেকে পাইবার জন্যই নানা পথে নানা মতে চলিতেছে।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে মানুষ যে আনন্দ চায় সে আনন্দ কোথায়? নিজেই কি সেই আনন্দ? বাস্তবিক পক্ষে আনন্দ নিজের ভিতরেই পাওয়া যায়, বাহিরের কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না। সুখ দুঃখ যখন নিজের ভিতরে, তখন নিজেকে পাওয়া গেলেই সব পাওয়া যায়। মানুষ নিজেই সেই আনন্দ স্বরূপ। সেই আনন্দ পাইবার জন্যই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম নিয়া এত আন্দোলন চলিতেছে। কেহ বলিতেছে জ্ঞান বড়, কেহ বলিতেছে ভক্তি বড়, কেহ বা বলিতেছে কর্ম্ম বড়। মানুষ 'বড়' 'ছোট' বিচার নিয়াই ব্যস্ত আছে। কিন্তু ঠিক ঠিক জ্ঞান আসিলে, ঠিক ঠিক ভক্তি আসিলে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম নিয়া আর কোন তর্ক থাকে না। জ্ঞান কি ভক্তি কি—তাহা না বুঝিতে পারিলেই তর্ক আসে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এক কথাই—এক আকর্ষণ। ভক্তি কি? যাঁহাকে পাইলে সব সাধ মিটিয়া যায়, যাঁহাকে পাইলে সব আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার প্রতি আকর্ষণ রাখা।

এই আকর্ষণকেই কেহ বলে ভক্তি, কেহ বলে জ্ঞান—মূল এক আকর্ষণই। ভক্তি করিবে কাহাকে তাহা ত জানিয়া লইতে হয়। একজন আছেন জানিতে পারিলেই, তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে। এই যে জানাটুকু তাহার নামই জ্ঞান। তবেই জ্ঞান না হইলে ভক্তি আসিতে পারে না। কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্য কি? সেই একজনকে সন্তুষ্ট রাখা; বিশ্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা একজন আছেন জানিলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার ইচ্ছা হইবে। জ্ঞান না হইলে ভক্তি কর্ম্ম কিছুই আসে না। শৈশবে কেহ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে পারে না, কারণ তখন জ্ঞান হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আসে তখন ভক্তিও আসে।

ধর্ম্মও সেইরূপ। আগে জানিতে হয় একজন মূলকারণ আছেন, তবেই তাঁহার উপর ভক্তি আসে। ভক্তির গাঢ় ভাবটাকে প্রেম বলা হয়। একজন আছেন বলিয়া যে জানা হইয়াছে সেই একজন যতই নিকটে আসেন ততই ভালবাসা গাঢ় হইতে থাকে—ইহাই প্রেম। তবেইত আর জ্ঞান ভক্তি লইয়া তর্ক করিবার কিছু রহিল না। একটা বিষয় জানাকেই জ্ঞান বলে। যাঁহাকে ভক্তি করিবে তাঁহাকে ত জানিতে হইবে। যে যতদূর জানিতে পারিবে তাহার ততদূর জ্ঞান আসিবে। যদি কেহ ভাবিয়া দেখে ভক্তি করে কেন, কর্ম্ম করে কেন, তবেই আর কোন গোল থাকে না। লোক

এই সব বিষয় ভাবে না বলিয়াই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম লইয়া এত তর্ক চলিতেছে। বল দেখি জ্ঞান না হইলে ভক্তি আসে কি করিয়া? একটী বিষয় না বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য তোমাদের ব্যাকুলতা আসিবে কি করিয়া? সুতরাং আগে চাই জ্ঞান। জ্ঞান হইলে ভক্তি আসিবে, কর্ম্মও আসিবে। তবেই আর তর্ক থাকে কোথায়? যতদিন পর্য্যন্ত ঠিক বুঝ না আসিবে ততদিনই এই তর্ক চলিবে; বুঝিতে পারিলে জ্ঞান কি ভক্তিকে, ছোট কি বড় দেখিবে না—তখন সমান ভাব দেখা যাইবে। এক ভাবেরই তিন অবস্থা—প্রথম জ্ঞান তারপর ভক্তি ও কর্ম্ম।

জ্ঞানের প্রথমেই ভক্তি ও কর্ম্ম আসে। জ্ঞানের এই প্রথম অবস্থাকে ভক্তি বলা যায়—ইহা ছাড়া ভক্তি পৃথক কিছু নহে। তুমি জানিতে পারিলে ভগবান আছেন,—তিনি তোমার সুখ দুঃখের কর্ত্তা। ইহা জানিতে পারিলেই তাঁহাকে তোমার ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে, না জানিলে ভক্তি আসিবে না। যতদূর জ্ঞান হইবে, ততদূর তোমার ভক্তি আসিবে। প্রথম মানুষের এই জ্ঞানটুকু হয় যে ভগবান একজন আছেন, তিনি আমাদের সুখদুঃখের কর্ত্তা, আমরা তাঁহাকে ডাকিলেই আমাদের ভোগসুখ নষ্ট হইবে না। অন্যায় কাজ করিলে শাস্তি পাইবে এই জ্ঞানটুকু হইলে মানুষ অন্যায় কাজ করিতে ভয় পায়। আরও কিছু জ্ঞান হইলে মানুষ বুঝিতে

পারে ভগবান আছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা চাই, তিনিই মানুষকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। যখন মানুষের এই জ্ঞান হয় তখন বিষয় ভোগের সুখ ছাড়িয়া পাপ তাপ হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য তাহার ভক্তি আসিয়া থাকে। তখনও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় না। যতই তিনি কাছে আসেন, ততই ভক্তের ভগবানের প্রতি ভালবাসা গাঢ় হয়—ইহাই প্রেম। প্রেমাবস্থায় ভক্তের হর্ষ, বিষাদ ও কম্প হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? একজন আছেন ভাবিতে ভাবিতে একটী আকার দেখা যায়। যে যে ভাবের মূর্ত্তির কল্পনা করে, সে সেইভাবের মূর্ত্তি দেখিতে পায়। যখন মন একটু স্থির হয় তখনই সেই রূপটী দেখা যায়, তখন হাস্য আসে; আর যখন মনের চঞ্চলতার জন্য সেই রূপটী দেখা যায় না, তখন দুঃখে ক্রন্দন আসে। তখন ভাব আরও গাঢ় হইয়া যায় তখন সেই ভাবের মূর্ত্তি আরও নিকটে দেখা যায়। তখন ভাবে বিভোর হইয়া ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারে না—তখনই কম্প হয়। ভক্তের এই হর্ষবিষাদাদি অবস্থা ভাবের মূর্ত্তি দেখিবার পূর্ব্বেও হইতে পারে। যখন ভগবান আছেন এই বিশ্বাসে তাঁহাকে পাইবার প্রবল ইচ্ছা হয়, তখনও ভক্তের এই সকল অবস্থা হইয়া থাকে। ক্রমে ভাব গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, তখন ভাবের মূর্ত্তি দেখা যায়। একটী

হইতেছে ব্যাকুলতার হর্ষবিষাদ, অপরটী হইতেছে ভাবের মূর্ত্তি দেখিয়া হর্ষবিষাদ ; একটী তরল, অপরটি গাঢ়।

অবস্থা ক্রমেই গাঢ় হইতে থাকে। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল রূপদর্শনাদির অবস্থা চলিয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় পৃথক কিছু নাই—আমি ভুলে পড়িয়া এই সব দেখিতেছি। সংসার বলিয়া কিছু নাই, বাহির দৃষ্টিতেই সংসার। বাহির দৃষ্টি চলিয়া গিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইলে বুঝা যায় মায়ার খেলা চলিতেছে, তাহাতে এইরূপ দেখা যাইতেছে, সকলই আমার কল্পনা, আমি ভুলে পড়িয়াছি —আমি সেই আনন্দস্বরূপ নির্ব্বিকার। আমার যতদিন পর্য্যন্ত দ্বৈতভাব আছে। ততদিন পর্য্যন্ত ভুল আছে ইত্যাদি তত্ত্ব ক্রমে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভক্তের অবস্থা বিষয় বলা হইল তাহা সকলেরই যে একই রকম হইবে। তাহা নহে। কাহারও ক্রমে জ্ঞান হয় কাহারও বা হঠাৎ জ্ঞান হয়। যাহাদের ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হয় তাহাদের উল্লিখিত অবস্থাগুলি আসিয়া থাকে। আর যাহাদের প্রথমেই এই বিচার আসে,—আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, জগৎ কি, আনন্দ কোথায়— তাহাদের এই সব রূপ দর্শনাদি হয় না। তাহারা সর্ব্বদাই আত্ম চিন্তা করিয়া থাকে। আত্ম চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের সেই আত্মস্বরূপ বিকাশ পায়।

জ্ঞান ও ভক্তি এক ভাবেরই রূপান্তর মাত্র। প্রথম একটু জ্ঞান হইলেই, ভক্তি আসে, তখন ভক্তি করিতে করিতে ক্রমেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। ভগবান আছেন এই জ্ঞান হইলেই ভগবানের প্রতি ভক্তি আসে তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে সকল ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

মানুষ জ্ঞানের শেষটাই দেখে, প্রথমটা, আর দেখে না, তাই জ্ঞান ভক্তি লইয়া তর্ক চলিতেছে। কর্ম্ম করিতে করিতে ত্যাগ আসে। তোমার জ্ঞান না হইলে তুমি কর্ম্ম করিবে কেন? যখন তোমার এই বুঝ আসিবে যে তোমার ত্যাগ করা দরকার তখনই তুমি কর্ম্ম করিতে পারিবে। একটু জ্ঞান না হইলে ভক্তি কর্ম্ম কিছুই আসে না। সত্যটা বুঝিয়া সত্যের কাজ করিতে করিতে পূর্ণ জ্ঞান আসে; যে যতটুকু বুঝিতে পারে সে ততটুকু কাজ করে। না বুঝিয়া কেহ কিছু করিতে পারে না। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম সকলই সকলের সাহায্যকারী। সত্যপথে চলিতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই দরকার। জ্ঞান হইলেই ভক্তি ও কর্ম্ম আসিবে। যতদিন জ্ঞানের অবস্থা থাকে ততদিন ভক্তি কর্ম্মও থাকে। সেই ভক্তিকর্ম্ম কাহারও বাহিরে প্রকাশ, আর কাহারও বা ভিতরে উপলব্ধি। ইহাই পার্থক্য। যাহাদের ভক্তি কর্ম্ম বাহিরের, তাহারা একজন ভগবান আছেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে, তাঁহাকে ডাকে, তাঁহাকে ভালবাসে ও তাঁহার

ধ্যান করে। আর যাহাদের অন্তরে ভক্তি, তাহারা ভগবান বলিয়া ডাকে না, তাহারা সেই পরমাত্মাকেই চিন্তা করে—পরমাত্মার ধ্যান করে। তাহাদের বাহিরের কোন কাজ থাকে না। শুধু এক চিন্তাই থাকে। কেহ কেহ একজন ভগবান আছেন এই ধারণা করিয়া ভগবানকে ডাকে, আর কেহ কেহ ভগবান না মানিয়া এক পরমাত্মাই আছেন এই ধারণা করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকে। যার যতটুকু জ্ঞান হয় সে ততটুকু বুঝিতে পারে। যাহারা কেবল্ আত্মার ধ্যান করে, আত্মা ভিন্ন কিছু জানে না তাহারা, যাহারা বাহিরে ভক্তি করে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে ভগবান বলিয়া কিছু নাই, এক আত্মাই আছেন, তাঁহাকে লাভ করা চাই। যাহারা আত্মাকে ভগবান বলিয়া থাকে তাহাদেরও এমন একটী সময় আসিবে যখন তাহারাও সেই পরমাত্মার ধ্যান করিবে। আর যাহারা আত্মাকে ধ্যান করে তাহাদেরও এমন সময় আসিবে যখন তাহারা কাহারও ধ্যান করিবে না, নিজের ধ্যানই নিজে করিবে। তখন নিজ ভিন্ন আর যে কেহ আছে সেই ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে; নিজেই সব—এই জ্ঞান আসিবে। পৃথক সত্তা থাকিবে না। যে যত দূর অগ্রসর হয় তাহার ততখানি ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

যাহা কিছু দেখা যায় সকলই মিথ্যা, তাহাতে শান্তি, আনন্দ নাই, নিজের ভিতরই শান্তি আছে—এইরূপ বুঝার নামই জ্ঞান।

আর, যাহা দেখা যায় তাহাতে শান্তি নাই; ভগবান আছেন তাঁহাকে পাইলেই শান্তি পাওয়া যায়—এই বুঝের নাম ভক্তি। এখন দেখা যায় জ্ঞান ভক্তি নিয়া তর্কের আর কিছু রহিল না। 'ভগবান আছেন' এই জ্ঞানটুকু যাহার হয় তাহার 'ভগবান বলিয়া পৃথক কিছু নাই, আমিই সব'—ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞান ও আসিবে। যাহাদের ঠিক জ্ঞান হয় না, আর যাহাদের ঠিক ভক্তি হয় না তাহারাই এই সব নিয়া তর্ক করিয়া থাকে। ভক্তিকে নিন্দা করার কিছু নাই। যতদূর জ্ঞান হইবে, ততদূরই বুঝ আসিবে। না বুঝার চেয়ে ক্রমে ক্রমে বুঝাও ভাল। তাহাতে নিন্দার কি আছে? সেইরূপ যাহারা বুঝিয়াছে—ভগবান বলিয়া পৃথক কিছু নাই, আমি আমার ভুলে পড়িয়াছি—ভক্তদের পক্ষে তাহাদের নিন্দা করিবার কিছু নাই। ঠিক জ্ঞান ভক্তি প্রাণে আসে না বলিয়াই নিন্দা আসে। জ্ঞান ভক্তি আর কি? এক ভাবেরই স্থির ও চঞ্চল অবস্থা। যতই স্থির হইবে, ততই নিজেকে নিকটে দেখিবে, আর যত দূরে থাকিবে ততই দ্বৈতভাব গাঢ় থাকিবে। যাহারা একটু চঞ্চল তাহারাই 'আমি ও ব্রহ্ম এক' ভাবিতে পারে না। আবার যখন তাহারা স্থির হইবে, নিজেকে নিকটে দেখিবে, তখন তাহাদের এই ভুল্ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কেহ ভক্তি ভালবাসে কেহ জ্ঞান ভালবাসে। ইহার অর্থ কি? এক ব্রহ্মরসই বিদ্যমান রহিয়াছে; যে যে স্থানে

ডুবিয়া আছে সে সেই রস ছাড়িয়া যাইতে পারে না—তাহার চেয়ে আরও ভাল রস যে থাকিতে পারে তাহা সে ভাবিতে পারে না ; তাহার নিকট উহাই ভাল লাগে । যাহারা বুঝিতে পারে এই সকল ভগবৎ-দর্শনাদি রস ও স্থায়ী না পৃথক স্থায়ী রস আছে এবং তাহা নিজের ভিতর, তাহাদের মনে বিচার চলিতে থাকে, তাহারাই জ্ঞানপথ অবলম্বন করে,—তাহাদের দ্বৈতভাব থাকে না। সেই প্রকৃত জ্ঞানী। আর যাহারা ভগবান ভিন্ন আর কিছু জানে না, কেবল ভগবানকে ভাবে, বিষয়ভোগের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না—সেই প্রকৃত ভক্ত। ভোগরক্ষার জন্য যাহারা ভগবানকে ডাকে, তাহারা ঠিক ভক্ত নহে, তাহারাই জ্ঞান ভক্তি লইয়া তর্ক করিয়া থাকে, যাহারা সকল ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবচ্চিন্তা করিয়া থাকে, আর কিছু চাহে না, তাহাদের শীঘ্রই পূর্ণ জ্ঞান আসিবে। কিন্তু যাহারা ভোগের জন্য ভগবানকে ডাকে, তাহাদের শীঘ্র মুক্তি হয় না, তবে তাহাদেরও এই অবস্থা থাকিবে না। তাহারা অনেক দূরে সরিয়া আছে বলিয়া ভোগছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না। যে যত আত্ম সমীপে আসিবে, তাহার তত ত্যাগ আসিবে। ভোগ কি ? যে যে অবস্থায় আছে তাহাই ভাল লাগা। ত্যাগ কি ? যে যে অবস্থায় আছে তাহা ভাল না লাগা। কাহারও ভোগ ভাল লাগে, কাহারও বা ত্যাগ ভাগ

লাগে। ভোগীই ভাবে এই সংসার সত্য, কিন্তু ত্যাগীর দৃষ্টিতে সংসার মিথ্যা। ত্যাগীই জ্ঞানী।

আত্মা দূরে থাকিলেই জগৎ সত্য বলিয়া মনে হয়; আত্মা নিকটে আসিলেই জগৎ মিথ্যা জ্ঞান হয়। চিত্ত যতক্ষণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণই দুই দেখা যায়। যতই স্থির হইবে ততই একত্বের ভাব ঘণীভূত হইয়া আসিবে। জ্ঞানী আর ভক্ত কি? এক দেখিলে জ্ঞানী বলে, দুই দেখিলে ভক্ত বলে—মূলে একই। যে যতদূর স্থির হয় সে ততদূর অনুভব করিতে পারে। যাহারা চঞ্চল তাহাদের জগৎই সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে—তাহারা ইহার অধিক কিছু ধারণা করিতে পারে না। তাহাদের ধারণা যতদূর ততদূরই তাহারা বিশ্বাস করে। যাহারা সামান্য কিছু স্থির হইয়াছে তাহাদের ধারণা—সংসার সত্য, ভগবান আছেন, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি ইহ ও পর জীবনে সুখ দিবেন। এই ভাবের লোকেরা সংসারে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র রক্ষা করিয়াও ভগবানকে ডাকে। এই অবস্থা হইতে আরও স্থির ভাব আসিলে ধারণা হয়—সংসার ও স্ত্রীপুত্র রক্ষা করিয়া ভগবান পাওয়া যায় না, সব ছাড়িতে হয়। তাহারাই সব ছাড়িয়া ভগবানকে ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে ভাবের মুর্ত্তি দেখিতে পায়। তাহারাই ঠিক ভক্ত। যাহারা আরও স্থির হয় তাহাদের ধারণা—জগৎ বলিয়া কিছু নাই, আমি আমার ভুলি পড়িয়াছি, এক ব্রহ্মই সত্য। তাহারা সর্ব্বদা ব্রহ্ম চিন্তা

করে, ব্রহ্ম ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্ম হইয়া যায়। তাহাদিগকেই ঠিক জ্ঞানী বলে। ভক্তি আর কিছুই না—জ্ঞানের একটী নিম্নস্তরের অবস্থামাত্র। যাহার জ্ঞানের যতদূর বিকাশ পায়, তাহার ততদূরই ধারণা হয়, ততদূরই সে অনুভব করিতে পারে।

মানুষ একটু ভাবিলেই আর তর্কের কিছু থাকে না; আমি কে? ভগবান কে? এই বিচার করিলেই সব ভূল চলিয়া যায়। ধীর ব্যক্তিরাই এই সব চিন্তা করিতে পারে তাহাদের তর্ক থাকে না। আর যাহারা অস্থির, তাহাদের উচ্চ চিন্তা আসিতে পারে না—তাহারাই তর্ক নিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে 'আত্মা নিকটে বা দূরে, তাহার অর্থ কি? মন স্থির হইলে আত্মা নিকটে আসেন, আর চঞ্চল হইলে দূরে থাকেন। মন যতই চঞ্চল হইবে, আত্মা ততই দূরে সরিবেন। আত্মার তরঙ্গই মন; মন বলিয়া ভিন্ন পদার্থ কিছু নাই। আত্মা সর্ব্বদাই নিকটে আছেন, কিন্তু খণ্ডজ্ঞানে দূরে দেখা যাইতেছে।

খণ্ডজ্ঞানই ভক্তি। আত্মা অখণ্ড ও অদ্বয়। সর্ব্বব্যাপী আত্মা সর্ব্বস্থানে বিরাজমান আছেন। যাহারা খণ্ডজ্ঞানী তাহারাই খণ্ডভাবে দেখিতেছে। ভাবাতীত অবস্থায় আত্মা অখণ্ড। আত্মা যখন ক্রিয়াশীল, তখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আমিত্বজ্ঞান আসে। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র বিরাজ-

মান থাকেন। আমিত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা কামনার উৎপত্তি হয়। বাসনায় মনকে চঞ্চল করিয়া রাখে ; তখন মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়—নিজের আনন্দস্বরূপ ভুলিয়া চারিদিকে আনন্দ চাহিতে থাকে। 'আমার' 'আমার' জ্ঞানে, 'আমি' দেহ, মনও অহঙ্কারে বদ্ধ হইয়া পড়ে। আমি যে দেহ না এই জ্ঞান ভুলিয়া আমি দেহ, এই জ্ঞান আসে। পরে 'আমার মন, বুদ্ধি' এই কল্পনার উৎপত্তি হয়। ক্রমে মায়ার কল্পনা চলিতে থাকে। প্রথম আমার মন বুদ্ধি ; তারপর আমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী ; তারপর বাড়ী ঘর দেশ প্রভৃতি। তখন নিজের ভিতর সুখ না চাহিয়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের নিকট সুখ চাহিতে থাকে। তাহাদের নিকট সুখ না পাইয়া অন্যের নিকট সুখ চাহিতে থাকে। ক্রমেই 'আমার' 'আমার' জ্ঞান গাঢ় হইতে থাকে। এক হইতে বহু হইয়া যায়। তখন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া বিকৃত অবস্থায় বহু দেখিতে থাকে।

আত্মার প্রকৃত অবস্থা অখণ্ড, বিকৃত অবস্থা খণ্ড। চঞ্চল অবস্থায় এক অখণ্ডভাব বহুরূপে দেখা যায়। স্থির হইলে আবার একই দেখা যাইবে। সগুণ অবস্থা হইতে নির্গুণ অবস্থায় যাইতে সগুণের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। কল্পনা দ্বারাই কল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যায়। নির্ব্বিকল্প স্থানে কল্পনা দিয়াই যাইতে হয়।

নিরাকারে যাইতে সাকার ধরিয়াই যাইতে হইবে। যে কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যায় সে কর্ম্ম বিষয়কর্ম্ম নহে। যাগ, যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত এইসব ফলাকাঙ্খা করিয়া করা হয়। ইহা দ্বারা পরজীবনে আরও ঐশ্বর্য্য হইবে এই আশাতেই লোক তাহা করিয়া থাকে। আশাই বন্ধন। বিষয়কর্ম্মও মানুষ আশায় করিয়া থাকে। মানুষ যশ, মান, বিদ্যা, ধন ইত্যাদি উপার্জ্জন করে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের নিকট সুখ পাইবার আশায়। সুখ যখন নিজের ভিতরে তখন দশদিকে ছড়াইয়া সুখ চাহিলেও সে সুখ পাইবে না। সত্যতত্ত্ব ও ঠিক উদ্দেশ্যই দশদিক হইতে মন গুটাইয়া একদিকে আনা। বিষয় কর্ম্ম কি? দশদিকে ছড়াইয়া থাকা,—বাহিরে আনন্দ চাওয়া। বাহিরে কিছুর মধ্যেও যখন আনন্দ নাই, তখন বিষয়কর্ম্ম করিয়া মানুষ আনন্দ পাইতে পারে না। যাহা বন্ধনের কারণ তাহা দ্বারা মুক্তি পাইতে পারে না। এই সকল কর্ম্মই আশার কর্ম্ম। তবে কি কর্ম্ম করিলে বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়? প্রথম সৎসঙ্গ, তত্ত্বালাপ ও জপতপাদি সৎকর্ম্ম করিতে হয়। অর্থাৎ বহু ছাড়িয়া একদিকে যাইতে যে সকল কর্ম্মের দরকার তাহা করা উচিত। বিষয়কর্ম্মে মন দশদিকে ছড়াইয়া আছে,—আর সৎকর্ম্ম করিতে সেই মনকে একদিকে আনা হয়। কাহারও নিকট সুখ না চাহিয়া একদিকে তাকাইয়া থাকা ও সেই উদ্দেশ্য লইয়া পূজা, জপ, তপ ইত্যাদি করাই সৎকর্ম্ম।

একদিকে কাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিবে? এইখানেই কেহ কেহ—এক জন ভগবান আছেন ধারণা করিয়া তাঁহাকেই ভাবিতে থাকে। আর কেহ কেহ—আত্মাই আছেন, ভগবান বলিয়া পৃথক কেহ নাই—এই ধারণা করিয়া একমাত্র আত্মার চিন্তাই করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ ধারণা করিয়া থাকে—আমিই আত্মা, ভুলে পড়িয়াছি, আত্মচিন্তা করিলে আমি সেই আনন্দস্বরূপ হইব। সে সর্ব্বদাই আত্মচিন্তা করিয়া থাকে। কিন্তু এই ভাবের লোক অতি অল্প। ভক্তই বেশী; ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানী ভক্তের চেয়ে কম। বহু মতের লোক আছে। তন্মধ্যে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত—এই তিনটী মতই সাধারণতঃ প্রচলিত রহিয়াছে। এই তিনের মধ্যে অদ্বৈত মতই সর্ব্বোচ্চ।

———

ষট্ চক্র।

ব্রহ্মই সত্য। জগৎ বলিয়া যাহা মানুষ প্রত্যক্ষ করে তাহা কল্পনার সৃষ্টি। মরুভূমিতে তৃষাতুর মৃগ যেরূপ ভ্রমে মরীচিকা দর্শন করে, জীবসকলও আশার কুহকে, মনের কল্পনায় জগৎ-মরীচিকা দর্শন করে। আশার বিনাশ হইলে মানসিক কল্পনা থামিয়া যায় এবং তখন জগৎ-মরীচিকারূপ ভ্রম দূরীভূত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় মনের কাজ স্থগিত থাকায় জগতের সত্তা থাকে না। সুতরাং মনই জগৎ রচনা করিয়া থাকে, মন আত্মার তরঙ্গ মাত্র।

আত্মা একটু চঞ্চল অবস্থাপন্ন হইলেই ভুলে পতিত হয়। আত্মা তখন মন উপাধি ধারণ করে। কিরূপে এবং কেন আত্মা চঞ্চল বলিয়া বোধ হয় তাহা বলা যায় না। সমুদ্রে বুদ্বুদের মত রূপকাদির সাহায্যে মানুষ তাহার কতক আভাস পাইতে পারে মাত্র। আত্মা একটু চঞ্চল হইলেই 'আমি আকাশ স্বরূপ' এই বোধ হয়। তখন মনে হয় 'আমি সর্ব্ব-ব্যাপী বিরাট স্বরূপ্'। তখন 'আমি' এবং 'আমি' কিরূপ' এই দুই খণ্ডাবস্থার উৎপত্তি হয়। যেরূপ মাটির হাতী দেখিলে বাস্তবিক তাহা মাটির হইলেও হাতী বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ

'একমাত্র আমিই আছি' এই একমাত্র অহংজ্ঞান অবস্থায় 'আমি' এবং 'আমি যে আছি' এই জ্ঞান হইতে দ্বৈতজ্ঞান উপস্থিত হয়। 'আমি' যে দেখিলাম 'আমি আছি'—এই যে আমার জ্ঞান হইল ইহাই খণ্ডাবস্থা হইল। এইরূপে ক্রমে চঞ্চলতা দ্বারাই ভুলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। চঞ্চলতা নিবন্ধন 'আমিই এক বিরাট স্বরূপ' এইরূপ কল্পনা হইতে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপ কল্পনার উৎপত্তি হয়। ইহা দ্বারাই জগৎ রচনা হইয়া থাকে এবং অহঙ্কারাদি কামনার সাহায্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-রূপ কুহক তৈয়ারী করিয়া জীব বাসনা জালে বদ্ধ হইয়া থাকে। শরীরাদির বাস্তবিক কোন সত্তা না থাকিলেও মনের চঞ্চলতা বশতঃ কামনাদি দ্বারা মানসিক বিকার সৃষ্টি হইয়া তাহা হইতে শরীরাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা হইতেই জগৎরূপ ভেল্কী-বাজী দৃষ্ট হয়। শরীর বস্তুতঃ অসত্য, কল্পনার ফল; এবং কল্পনা মনের চঞ্চলতার কাজ। মন বলিয়াও কিছু নাই; চঞ্চলতার জন্যই মন আছে বলিয়া বোধ হয়। মন আত্মার তরঙ্গ মাত্র। মনের সত্তা নাই, একমাত্র আত্মাই বিরাজমান, আর সকলই কল্পনাপ্রসূত।

কল্পনা পরিমাণভেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। মন যত চঞ্চল হয়, কল্পনা তত গাঢ় হইয়া থাকে। মন একটু চঞ্চল হইলে সূক্ষ্মাকার ধারণ করে এবং ক্রমশঃ বেশী চঞ্চল

হইলে স্থূলাকার ধারণ করে। সূক্ষ্ম কল্পনাই ক্রমে স্থূলভাব ধারণ করে। সূক্ষ্ম ও স্থূলের পার্থক্য এই পরিমাণ ভেদ মাত্র।

মন নিয়তই অনেক সূক্ষ্ম কল্পনা করিয়া থাকে। কল্পনা যত পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত হয়, ততই স্থূলাকার ধারণ করে—কল্পনার স্থূলভাবই এই পাঞ্চভৌতিক দেহ। মনের চঞ্চলতার অনুপাতে কল্পনার হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং মন বেশী চঞ্চল হইলে কল্পনা বেশী হয় ও স্থূলাকার ধারণ করে। কল্পনা, আশা, কামনা প্রভৃতি সকলই এক মনের বিকার মাত্র। মনের বিকারের বৃদ্ধির সঙ্গে এ জগতের বিষয় বৃদ্ধি পায়।

মানসিক বিকার ঘনীভূত হইয়াই স্থূলাকার ধারণ করে এবং নিজকে দেহ বলিয়া মনে হয়। তৎসঙ্গে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া, আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার কাজ প্রভৃতি আমিত্ব জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া ভ্রান্তি সুদৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। তখন আত্মা বলিয়া কিছু আছে ইহা স্মরণ হয় না এবং ভ্রান্তি বা মায়াতে মনে কল্পনার পর কল্পনার উদ্ভব হইয়া জীব ঘূর্ণীপাকের মত ঘুরিতে থাকে। এইরূপে বাস্তবিক কিছুর সত্তা না থাকিলেও মনের কল্পনা দ্বারা জগৎ মরীচিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনের এই কল্পনার গতি অবিরাম ভাবে চলিতে থাকে। আশার পর আশার সৃষ্টি হইয়া মন আশাকুহকে মজিয়া থাকে, কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। আকাশ মেঘে পরিব্যাপ্ত থাকিলে যেরূপ সূর্য্য দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ মন অনিত্য আশামেঘে

আবৃত থাকিলে আত্মা প্রকাশ পাইতে পারে না। জ্ঞান-বলে মিথ্যা আশার উচ্ছেদ হইলে আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়।

মন ভ্রান্তিতে আছে এই ধারণা জন্মিলে ভ্রান্তিদূর করিবার জন্য জীবের প্রয়াস হয়। ভ্রান্তি বোধ না হইলে ভ্রান্তিদূর করিবার চেষ্টা আসিতে পারে না। মোহে ডুবিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ জন্মিলেই মোহ কাটাইয়া চৈতন্যলাভের জন্য তাহার ইচ্ছা হয়। জীব সংসারের মোহজালে বদ্ধ হইয়া সুখদুঃখের ঘূর্ণীপাকে ঘুরিতে থাকে এবং মোহে ডুবিয়া রোগ, শোক, মৃত্যু আদি ত্রিতাপ জ্বালায় দুঃখ পায়। যখন দুঃখজ্বালা অনুভব হয় তখনই ভূল ভাঙ্গিবার জন্য তাহার চেষ্টা হয়। সংসারচক্রে দুঃখের পর দুঃখের উদ্ভব হয় এবং সংসারে শান্তি নাই এইরূপ বোধ হয়। তখন মানুষ আশার অসারত্ব বুঝিতে পারে এবং নিত্য শান্তি লাভের জন্য প্রয়াসী হয়। সাধারণতঃ জরা, মৃত্যু প্রভৃতিই মানুষকে আশার অসারত্ব বুঝাইয়া দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া থাকে। তখন জীবের মনে বৈরাগ্য জন্মে। এই জগতের ভোগে শান্তি নাই বুঝিয়া এই সকলের রসে তাহার বিরাগ উপস্থিত হয়। এই বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইলে মানুষ সাধন দ্বারা আশার স্রোত মন হইতে দূর করিয়া ফেলে এবং নিত্য বস্তু লাভের জন্য চেষ্টা ও যত্ন করে। তাহাতে তাহার কল্পনার চিত্রাঙ্কন সংক্ষেপ হইয়া আসে; মন ক্রমশঃ স্থির হইতে স্থিরতর অবস্থা লাভ করে। মন যতই স্থির হয়,

ততই মনের ঊর্দ্ধগতি হইতে থাকে এবং মানসিক বিকার ততই তরল হইয়া যায়। ক্রমশঃ স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মন স্থিরতার ক্রমানুসারে অনেক অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা লাভ করে। মনের স্থিরতার পার্থক্য অনুসারে কল্পনা বা মানসিক বিকার কম বা বেশী হইয়া থাকে। মানসিক বিকার অধিক হইলে মনের নিম্নগতি হয়; ক্রমশঃ কম হইলে তাহার ঊর্দ্ধগতি হয়।

মনের এই স্থিরতার ক্রমানুসারে মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরে কয়েকটী পৃথক পৃথক অংশ যোগীরা কল্পনা করিয়া থাকে এবং তাহাদের কোন ভাগে মনের কিরূপ ভাব হয় তাহাও তাহারা লক্ষ্য করে। এই রূপ মনের গতিভেদে শরীরাভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবের সাহায্যে ষট্‌চক্র কল্পনা করা হইয়াছে। এই ষট্‌চক্র মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। ষট্‌চক্র কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ তাহার কোন সত্তা নাই। মন বহির্মুখী মায়ার খেলা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকিলে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অন্তর্মুখী মায়ার যে খেলা দৃষ্ট হয় তাহাই ষট্‌চক্র বলিয়া কথিত হয়। গুহ্য ও লিঙ্গমূলের মধ্যভাগে মূলাধার,, মূলাধার ও নাভিমূলের মধ্যভাগে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠানের উপরে নাভি-মূলে মণিপুর, মণিপুর ও কণ্ঠের মধ্যভাগে হৃদ্দেশে অনাহত,

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্র, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে আজ্ঞাচক্র ও শিরোদেশে সহস্রার কল্পনা করা হইয়াছে।

সাধারণ জীবের মন আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া মায়া বা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া বিকারের রসে মজিয়া থাকে। এইরূপ জীবের মন অত্যন্ত ভোগাসক্ত। ভোগাসক্তির জন্য মন বিকারগ্রস্ত থাকে, তখন মানসিক কল্পনা দ্রুতগামী হয়; এবং মন মিথ্যা মায়ার রাজ্যে কামনার জিনিষ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া সত্যের ধারণা করিতে পারে না। এইরূপ জীবের মন সাধারণতঃ শরীরের নিম্নভাগে গুহ্য ও লিঙ্গমূলের মধ্যভাগে সতত বিচরণ করে। মন যখন এইরূপ অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে মূলাধারে অবস্থিত বলা যায়। ঘোর ভোগাসক্ত, বিকারগ্রস্ত লোকের মন মুলাধারে বিচরণ করে। মন শরীরের এই অংশে থাকিলে অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, সত্য ধারণা করিতে পারে না এবং কাল্পনিক রসে ডুবিয়া থাকে। তখন মানুষ বিষয় বাসনার রসে মত্ত ও কামনাপঙ্কে লিপ্ত থাকে এবং বিবেক বিচারহীন হয়। মনে জগতের কল্পনা সকল সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং কল্পনা ছাড়িয়া তত্ত্ববিষয় ভাবিবার মনের শক্তি হয় না। ইচ্ছাশক্তি নিম্নমুখী হইয়া অবস্থান করে—জীব উর্দ্ধদৃষ্টি করিতে পারে না। এই ইচ্ছাশক্তি, যাহাকে যোগীরা কুণ্ডলিনীশক্তি বলে, সুপ্ত থাকায় মনে সত্য ধারণার শক্তি আসে না। সুপ্তাবস্থায় যেমন জগতের

সত্তা বোধ হয় না, তদ্রূপ সকলের মধ্য এক অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকিলে ও মন মোহ অন্ধকারে ডুবিয়া থাকায় কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্ত থাকে, সুতরাং মনে জগতাতিরিক্ত তত্ত্ব উদিত হইতে পারে না।

মন যখন একটু সত্যাভাস পায়—বিবেক বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করে, অথচ বিষয় বাসনার রসেই ডুবিয়া থাকে, তখন মন স্বাধিষ্ঠানে উঠিয়া থাকে। এখানে আসিলে মনের অপেক্ষাকৃত স্থিরভাব হয়—মন তখন সত্য বিষয় ও তত্ত্বকথা শুনিতে সুখবোধ করে। তখন মন বিষয়রস ছাড়িতে না পারিলেও তদতিরিক্ত উচ্চ বিষয় সকল শুনিতে ইচ্ছুক হয়। মূলাধার হইতে মনের যেখানে একটু স্থির ভাব হয় তাহাই স্বাধিষ্ঠান। এখানে মন আসিলে মমে বিবেক জ্ঞান একটু একটু বিকাশ পায়। এখানে মন ক্রমশঃ স্থিরতর অবস্থা লাভ করিলে উর্দ্ধগতি হইয়া মণিপুর অভিমুখে যায়। কিন্তু এখানে মন পুনরায় ভোগাসক্ত ও চঞ্চল হইলে মুলাধারে নামিয়া পড়ে। মূলাধারে মন থাকিলে জগৎকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। জগৎ ভিন্ন অন্য কিছু আছে বলিয়া মানুষের ধারণা বা বিশ্বাস জন্মে না। জগতের সুখই সত্য বলিয়া তাহার বিশ্বাস হয়। জগৎকল্পনা প্রসূত, সুতরাং অস্থায়ী এই জ্ঞান তাহার হয় না। কিন্তু মন স্বাধিষ্ঠানে আসিলে মানুষ একটু বিবেক লাভ করে, জগৎকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস

থাকিলেও তদতিরিক্ত জগতের মূলকারণ জগৎকর্ত্তা কেহ আছেন বলিয়া ধারণা করে ও জগৎকর্ত্তার প্রতি তাহার বিশ্বাস জন্মে। তখন মনে সদসৎ বিবেক জন্মে ও মানুষ সদসৎ কামনার পার্থক্য দেখিতে পায়। কামনা ত্যাগের একটু একটু ইচ্ছাও তাহার হয়। মন ভোগে লিপ্ত থাকিলেও মানুষ সদসৎ বিবেক-পূর্ব্বক ভোগ করে। স্বাধিষ্ঠানে মনের এইরূপ অবস্থা হয়। সাধারণ জীবের মন এই দুই স্থানেই যাতায়াত করে।

স্বাধিষ্ঠানে যেরূপ অবস্থায় থাকে তাহা হইতে আর একটু স্থিরতর হইলে মন মণিপুরে অবস্থিতি করে। স্থূলদেহে মণিপুরের স্থান নাভিদেশ। মন এইস্থানে উঠিলে ভিতর যেন খুব জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি হয়—ইহাই মনের আলোক দর্শনাদি অবস্থা। এইস্থানে মন থাকিলে মন সংসার হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং সংসারের বিষয় বাসনা মন হইতে অপসারিত হয়। মন তখন সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া পড়ে। তখনও সংসার দেখা যায়, কিন্তু তাহা দর্পনের উপর যেন ভাসমান এইরূপ দেখা যায়,—স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। তখন সাধকের মন সংসার হইতে পৃথক থাকিতে ইচ্ছুক হয়। এ জগতের কিছু ভাল মনে হয় না। মন সৎপ্রসঙ্গ, তত্ত্বকথা প্রভৃতি শুনিতে ও আলোচনা করিতে লালায়িত হয়। তখন মন এ জগতের রস পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতের রসে ডুবিতে থাকে। তখন বাহ্যিক কল্পনাসমূহ

ক্রমে লোপ পায় এবং অন্তরে দেবদেবীর কল্পনা খেলিতে থাকে। যে সাধক যে রূপ কল্পনা করিয়া আত্মচিন্তা করে সে সেই রূপ দর্শন করে; ভক্ত ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করে এবং জ্ঞানী নিজমূর্ত্তি দেখে। কল্পনার বাহ্যিক জগতে যে প্রকার রূপাদি দেখা যাইতে পারে সেই প্রকার রূপাদি দৃষ্ট হয় না—অতি উজ্জ্বলভাবে রূপ দেখা যায়। মন সেই জ্যোতির্ম্ময়রূপে তন্ময় হইয়া প্রগাঢ় আনন্দরস অনুভব করে। তখন মনের চিন্তা অন্তর্মুখী হইয়া যায়। বাহ্যিক চিন্তা ছাড়িয়া মন সর্ব্বদা অন্তর্চিন্তায় কাল কাটাইতে ইচ্ছুক হয়। মণিপুরে কল্পনার এইরূপ অন্তর্মুখী মায়ার খেলা হইতে থাকে। এখানে যে, যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে সে সেই রূপই দেখিতে পায়।

এই যে রূপাদি দেখা যায় তাহা বাহ্যিক দৃশ্যের মত দেখা যায় না—তাহা ভিতরে অনুভব হয়। এই সকলই কল্পনার খেলা, সেই জন্য বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবে এই সকল অবস্থার উপলব্ধি হয় জ্ঞানী সাধক এই সকল অবস্থা অতি অল্পমাত্রই অনুভব করে। এখানে মনের চঞ্চলতার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে রূপাদি দর্শনের তারতম্য হইয়া থাকে। যে সাধক এ স্থানের রসে মজিয়া থাকে সে বেশী রূপাদি লক্ষ্য করে, আর যে সাধক এ সকল ও কল্পনা বুঝিতে পারিয়া তদূর্দ্ধে উঠিবার জন্য বিচারপূর্ব্বক মনকে ঊর্দ্ধদিকে চালনা করে সে রূপাদি লক্ষ্য করে না।

এখানে মন আসিলে ইষ্টমূর্ত্তি আদি লক্ষ্য করিয়া যে জন মনে করে এই অবস্থাই সত্য, এই ভগবান লাভ হইল, সে এই সমস্ত রসে ডুবিয়া থাকে এবং নানাবিধ সিদ্ধাই লাভ করে। যাহাদের বিচারশক্তি কম, তাহাদের মন এখানে আসিলে তাহারা সিদ্ধাই ইত্যাদি লইয়া মজিয়া থাকে এবং নানাবিধ অন্তরের কৌতুক লইয়া ডুবিয়া থাকে। বাহ্যিক জগতের কল্পনা লোপ পাইয়া তখন অন্তর্জগতের কল্পনা সমূহ হইতে থাকে। জ্ঞানী সাধক বিচার বলে এ সকল ও কল্পনা ইহা বুঝিতে পারিয়া এই সকল কল্পনা কাটিয়া দেয়। মন ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিলে ক্রমশঃ স্থিরতর অবস্থা লাভ হয়। মণিপুরে অবস্থিতিকালে মন সর্ব্বদা ভাবের রসে থাকিতে চায় এবং ভাবিতে আরম্ভ করিলেই সেই এক জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করে।

মন ক্রমশঃ আরও স্থিরতর অবস্থা লাভ করিয়া অনাহতপদ্মে উঠিয়া থাকে। অর্থাৎ এ অবস্থা ও কল্পনামুলক বুঝিতে পারিয়া বিচার পূর্ব্বক সেই অবস্থা কাটিয়া ক্রমশঃ যে স্থিরতর অবস্থা লাভ হয় তাহাকে অনাহত বলে। মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে মনিপুরে থাকিবার সময় যে একটী জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখা যায়, (নিজ মুর্ত্তিই হউক বা ইস্টমুর্ত্তিই হউক), তাহা বহু হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হয়। এ জগৎ স্থায়ী এ বিশ্বাস দূর হইয়া যায়—মন অন্তরসে ডুবিয়া থাক। অনাহতপদ্মে

যে বহুরূপ দেখা যায় তাহাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলা যায়। মন এখানে আসিয়া কিছুকাল এক অবস্থায় থাকিলে এক প্রকার লুকোচুরি খেলা হয়—ইহাকেই প্রেমের খেলা বলে। মন এখানে থাকিলে একবার এই প্রকার জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপ দর্শন করে, আবার তাহা হারাইয়া ফেলে। তখন মন ব্যাকুল হইয়া পড়ে; মন ব্যাকুল হইলে পুনরায় সেই রূপাদি দৃষ্ট হয়। অনাহতে মন উঠিলে সকলের ভিতরই নিজমূর্ত্তি দেখা যায়—অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই—ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক নহে এইরূপ বোধ হয়।

অনাহতে মন থাকা কালে ধ্যানস্থ হইয়া বসিলে নিজের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যায় বলিয়া অনুভব হয়। নিজের ভিতরটা ফুট্‌বলের মত ফাঁপিয়া উঠে বলিয়া ধারণা হয় এবং তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান আছে এইরূপ অনুভব হয়। এই সময় সূক্ষ্ম দেহাদির গমনাগমন দেখা যায় এবং দূরে কোথায় কি হইতেছে ইচ্ছা হইলে বুঝিতে পারা যায়। এইখানে এইরূপ শক্তি আদি লাভ হয়, কিন্তু এ সকল ও কল্পনা—প্রসূত মায়ার দৃশ্য। জ্ঞানী সাধক এ সকলে উদাসীন থাকে। যাহারা এই সকল বিভূতি দেখিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের পক্ষেই এই সকল দর্শন ঘটে।

মন ক্রমশঃ সকল বিকার অতিক্রম করিয়া উচ্চে উঠিতে থাকে। মন বিশুদ্ধচক্রে উপস্থিত হইলে, মনের অত্যন্ত শান্তি

বোধ হয়। তখন দৃশ্য কিছুই থাকে না, অতি উচ্চে শূন্যে কেবল 'আমিই আছি' এইরূপ অনুভব হয়। মন আরও একটু স্থিরতর অবস্থা লাভ করিলে 'আমিই সকল, আমার ইচ্ছাতেই যেন সকল চলিতেছে' এই প্রকার জ্ঞান হইতে থাকে। মনের এই অবস্থার নাম বিশুদ্ধচক্রে অবস্থিতি বলা যায়।

মন ক্রমশঃ আরও স্থিরতর অবস্থা লাভ করিয়া আজ্ঞা-চক্রের অভিমুখে চলিতে থাকে। চক্র হইতে চক্রান্তরে যাইতে মনের অত্যন্ত ব্যাকুলতা দরকার। বিশুদ্ধচক্র অতিক্রম করিলেই মৃত্যু দূর হইয়া যায়—তখন দেহজ্ঞান থাকে না এবং সেই জন্য মৃত্যু ও থাকে না। মন আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করিলে জগৎ বলিয়া কিছু থাকে না। জগৎকল্পনাদি লোপ পাইয়া যায়। তখন 'একমাত্র 'আমিই আছি' এইরূপ জ্ঞান হয়—'আমিই যেন জগৎজোড়া, আমিই যেন বিরাট স্বরূপ' এই জ্ঞান হয়। কিন্তু এই অবস্থা ও ভুল। আজ্ঞাচক্রে মন থাকা কালে 'আমার' রূপ না থাকিলে ও 'আমি বিরাট' এইরূপ জ্ঞান থাকে। 'আমি আমার সর্ব্বব্যাপী বিরাটরূপ বোধ করিতেছি' এই দ্বৈতজ্ঞান থাকে। সূক্ষ্ম দ্বৈত বোধ হইতেই এই সংসারের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ভুল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এই অবস্থায় আসিলেই মানুষ মুক্ত হইয়া নিরাকার নির্ব্বিকল্প অবস্থা পায়। তাহাকেই সহস্রার বলে।

এই যে ষট্‌চক্ররূপ মনের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হইল তাহা সাধকের মনের গতি অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাহারা একমাত্র 'ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা' ইহা উপলব্ধি করে।